দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

স্বামীজীর
বজ্রনির্ঘোষে
আজও জাগে
শিহরন পৃঃ - ১১

যুব আইকন
বিবেকানন্দ এবং
আমাদের নবপ্রজন্মের
ভূমিকা পৃঃ - ১৪

৬৯ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ৯ জানুয়ারি ২০১৭।। ২৫ পৌষ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ২৪ পৌষ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৯ জানুয়ারি - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছে দাদার কীর্তি পার্ট টু
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার লড়াইটা এবার মায়াবতী বনাম বিজেপি-র ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষে আজও জাগে শিহরণ
▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১১

স্বামীজীর স্বপ্নের রূপায়ণে দীপ্যমান যুবজনতার কয়েকজন
▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৪

যুব আইকন বিবেকানন্দ এবং আমাদের লজ্জাজনক ভূমিকা
▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৭

কেদারনাথের ডোলিযাত্রায় ▯ সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস ▯ ২১

প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত
▯ এম জে আকবর ▯ ২৭

জনজীবনের নিরাপত্তার জন্যই সড়কের পাশে মদের দোকান নিষিদ্ধ ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ২৯

সংশোধিত প্রতিবন্ধী বিলে আশার আলো
▯ মাধবী মুখার্জী ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫-৩৬** ▯
সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮ ▯ **খেলা : ৩৯**
▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৬ জানুয়ারি ২০১৭

প্রকাশিত হবে ১৬ জানুয়ারি ২০১৭

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজনৈতিক দলের তহবিল

নোট বাতিলের পর প্রধানমন্ত্রী মোদীর নজর এবার রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল। নানা স্তরের নির্বাচনে যেভাবে দলগুলি টাকা খরচ করে তা থেকেই সন্দেহ জাগে সেখানে দুর্নীতি আর কালোটাকার লেনদেন হয়। এবারে সেই রাজনৈতিক দলগুলির তহবিল নিয়ে আলোচনা করেছেন অভিমন্যু গুহ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মমতার মোদী-বিরোধী আন্দোলন

ইংরাজি নববর্ষের সূচনায় জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কষ্ট স্বীকার করিয়াও নোট বাতিলের সিদ্ধান্তটিকে সমর্থন করিবার জন্য দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধিই এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এখন আবার 'মোদী হঠাও দেশ বাঁচাও' স্লোগান তুলিয়া রাজ্য জুড়িয়া আট দিন এই আন্দোলন চলিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সভা ও জেলাকেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। চিটফান্ড কাণ্ডে তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের গ্রেপ্তার ও দলের আরও কয়েকজন সাংসদকে সিবিআই-এর জিজ্ঞাসাবাদের আশঙ্কায় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও আক্রামক হইয়া উঠিয়াছেন। নোট বাতিলের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী যে সকল কারণের কথা বলিতেছেন, বিশেষত জনসাধারণের অসুবিধার কথা, তাহা হয়তো কিছুটা সত্য হইতে পারে। কিন্তু রাজ্যে অর্থব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, রাজ্যের মানুষের হয়রানির শেষ নাই, রাজ্যের পাটশিল্প ক্ষতির সম্মুখীন, চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি মিলিতেছে না, মনরেগা প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সরকার চেক দিলেও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইতেছে না, নগদ টাকার অভাবে গরিব মানুষ রাজ্যের কল্যাণকারী যোজনার লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, কৃষকেরা চাষ করিতে অসমর্থ হইতেছে, রাজ্যে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে ইত্যাদি অভিযোগের কতটা সারবত্তা আছে, তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিতেই পারে।

বস্তুত জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়াছেন দেশবাসী তাঁহার সহিত সহমত পোষণ করে। নোট বাতিলের প্রশ্নে কোথাও কোনো বিরোধিতা নাই। নগদ নোটের অভাবও প্রায় নাই। রাজনৈতিক কারণে নোট বাতিলের বিরোধিতা করিলেও কংগ্রেস এবং সিপিএম 'মোদী হটাও দেশ বাঁচাও' স্লোগানে শামিল হয় নাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আন্দোলনের কোনো সারবত্তা নাই। আসলে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে মমতা এই আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। সারদা ও অন্যান্য চিটফান্ড কাণ্ডে তাঁহার দলের কিছু নেতার যোগাযোগ প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। রোজভ্যালি কাণ্ডে তাপস পালের গ্রেপ্তারকে তিনি কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতি বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, প্রতিহিংসার রাজনীতি করিলে তো সিবিআই তৃণমূল কংগ্রেসের যে কোনো নেতাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা করে নাই। নির্দিষ্ট তথ্যাদি পাওয়ার পরই সিবিআই তাপস পালকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বস্তুত যদি কেহ দুর্নীতির মূল উচ্ছেদ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে দুর্নীতির অভিশাপের গোড়ায় কুঠারাঘাত করিতে হইবে। দুর্নীতি এমন এক বিকৃত কৌশল যাহা আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই দুইটি পরিসরের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে। পূর্বে অধিকাংশ সময়েই সরকার তাহাদের কাজকর্মের গোপন দোসর হইয়াছে কিংবা অসহায় দর্শক হইয়া থাকিয়াছে। ফলে তাহাদের ঔদ্ধত্য এতটাই বাড়িয়াছে যে তাহারা নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে মনে করিয়া থাকেন। সরকারের কোনো রকমের কড়া সিদ্ধান্তই তাহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না বলিয়া মনে করেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর কড়া দাওয়াইতে তাহাদের সেই নিশ্চিন্ততার আবহটি হঠাৎ তছনছ হইয়া গিয়াছে। আর এই বিভ্রান্তির কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের মোদী বিরোধী আন্দোলনের ডাক। মিথ্যার ভিত্তিতে এই আন্দোলন যে ধোপে টিকিবে না তাহা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সুভাষিতম্

শান্তিতুল্যং তপো নাস্তি ন সন্তোষাৎ পরং সুখম্।

ন তৃষ্ণায়াঃ পরো ব্যাধির্ন চ ধর্মো দয়াসমঃ।। (চাণক্য শ্লোক)

শান্তির মতো তপস্যা নেই, সন্তোষের তুল্য সুখ নেই, তৃষ্ণার মতো ব্যাধি নেই এবং দয়ার মতো ধর্ম নেই।

পশ্চিম পাকিস্তানি শরণার্থীদের স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। একটি অত্যন্ত মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি-পিডিপি নেতৃত্বাধীন সরকার। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি জানিয়েছেন তাঁর সরকার দেশভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের স্থায়ী আবাসিকের শংসাপত্র প্রদান করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরে খাতায় কলমে নথিভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানি শরণার্থী পরিবারের সংখ্যা এখন ১৯,৯৬০টি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে স্থায়ী আবাসিকের শংসাপত্র থাকলে শরণার্থীরা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন।

এদিকে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর হুরিয়ত নেতা সৈয়দ আলি শাহ্ গিলানি ও মিরওয়েজ উমর ফারুক এবং জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের ইয়াসেন মালিক উপত্যকা জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতারা সরকারকে দোষারোপ করে বলেছেন, এই সরকার মুসলমান-প্রধান জম্মু-কাশ্মীরের জনবিন্যাস পালটে দিতে চায়। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি জি.এ মির সরকার যদি বিধানসভাকে উপেক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা করে তা হলে তীব্র আন্দোলন করার হুমকি দিয়েছেন।

অন্যদিকে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি সৎ শর্মা সরকারের সাধারণ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে জানান ওই কর্মসূচিতেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের জীবনযাপনের মান আরও উন্নত করা যায় কিনা তা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স সংকীর্ণ রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। পশ্চিম পাকিস্তানি শরণার্থী অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান লাভারাম গান্ধী বলেন, 'সরকার যখন রোহিঙ্গা মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করে তখন কেউ কিছু বলে না, যত দোষ শুধু পশ্চিম পাকিস্তানি শরণার্থীদের।

কিছু দেশবিরোধী শক্তি জম্মু-কাশ্মীরকে মুসলমান-প্রধান রাজ্য বানাতে চাইছে।' যাদের নিয়ে এই চাপানউতোর তারা অবশ্য খুশি। দেশভাগের সময় ভারতে আসা মদনলাল দেবগৌড়া বলেন, 'এই প্রথম কোনো সরকার আমাদের পরিচয়পত্র দেবার কথা ভাবল। এবার আমরা ভোট দিতে পারব। রেশনকার্ড পাব। সরকার থাকার জন্য আমাদের যে বাড়ি দিয়েছে আমরা তার ট্যাক্স দিই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুঝতে পারি না এটা আমাদের দেশ কিনা!'

বাতিল টাকায় রাতারাতি সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ৮ নভেম্বর নোটবাতিল ঘোষণার পরমুহূর্ত থেকেই আমাদের দেশে বেআইনি টাকার মজুতদাররা যে কতটা ক্ষমতাবান ও সম্পদশালী তার নিত্যনতুন প্রমাণ তাঁরা রেখেই চলেছিলেন। ঘোষণার পর এই ধরনের বেপরোয়া কর্মকাণ্ডের হিসেব নিকেশ শুরু হতেই সামনে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। নোট বাতিল লাগু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাতিল টাকার বিনিময়ে তড়িঘড়ি ৪ টনের বেশি সোনা কিনেছেন নানান ব্যক্তি। এই ঘটনা ঘটেছে সারা দেশ জুড়ে। সোনার valuer-রা জানিয়েছেন ওই দিনের বাজারমূল্যে ক্রীত সোনার দাম ১২৫০ কোটি টাকা।

এর মধ্যে ২ টন সোনা যে-কোনো একদিনে মোট বিক্রিত সোনার সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে ওইদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। আয়কর ও ইডি দপ্তরের কর্তাদের মতে এই ধরনের কেনা বেচা অত্যন্ত সন্দেহ উদ্রেককারী। কালোটাকাকে সোনায় পরিবর্তিত করা অর্থাৎ পরিভাষায় Money Laundering এর মতো গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধের পর্যায় পড়ে এই ধরনের লেনদেন। দিল্লির এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর হিসেব ঘেঁটে দেখা গেছে তিনি শুধু ৮ তারিখেই ৭০০ খরিদ্দারকে ৪৫ কিলো সোনা বিক্রি করেছেন। অথচ ঠিক আগের দিন অর্থাৎ ৭ নভেম্বর এই বিক্রির পরিমাণ ছিল নগণ্য ৮২০ গ্রাম।

অন্য একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী চেন্নাইয়ের এক স্বর্ণকার ওইরাতে ২০০ কিলো সোনা বেচেছেন। জয়পুরের লাওয়াত জুয়েলার্সের খাতায় ৭ তারিখে সোনার স্টক ছিল ১০০ গ্রাম আর ৮ নভেম্বর রাত শেষে তা হয়ে যায় ৩০ কিলোগ্রাম। Directorate General of Central Excise Intelligence (DGCEI) এর সূত্র অনুযায়ী তারা ইতিমধ্যেই ৪০০ জন স্বর্ণকারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০ কোটি টাকা বিক্রয় শুল্ক ফাঁকি দেওয়াকে চিহ্নিত করেছে। দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী এই ফাঁকি দেওয়া শুল্কের পরিমাণ ভবিষ্যতে ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান। কেননা বিগত সপ্তাহে DGCEI আধিকারিকরা দেশজোড়া সবচেয়ে বড় গয়না বিক্রির ব্র্যান্ড ত্রিশূরের 'জয়ালুকাম'-এর বিভিন্ন বিপণীতে তল্লাশি চালিয়ে দেখেছেন এপ্রিল থেকে নভেম্বর অবধি পুরোদমে ব্যবসা চালিয়ে ৫.৭ টন সোনা বিক্রি করলেও বিক্রির ওপর শতকরা ১ শতাংশ হারে দেয় শুল্কের ১ পয়সাও দেয়নি। তল্লাশির পর তারা তড়িঘড়ি ১০ কোটি টাকা শুল্ক জমা দিয়েছে। দেশজুড়ে বাতিল টাকাকে রাতারাতি ধুয়ে ফেলার প্রকল্পে নিত্য নতুন রাঘববোয়াল নানান কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ছেন। এঁদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হবে বলেই দপ্তরের অনুমান।

চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে তৈরি ভারত : সেনাপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের সেনাবাহিনী চীন কিংবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে তৈরি বলে জানিয়ে দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। সম্প্রতি ভারত ৫০০০ কিলোমিটার সীমাপর্যন্ত অগ্নি - ৫ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করায় চীনের গাত্রদাহের কারণ হচ্ছিল। কারণ এর ফলে ভারতের নাগালে চীন চলে আসবে। এরপরেই বেজিং ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাওয়া গরম করতে শুরু করে দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২ জানুয়ারি সেনাপ্রধানের মন্তব্যকে পাক-চীনের প্রতি ভারতের হুঁশিয়ারি বা সতর্কবার্তা হিসেবেই দেখতে চাইছেন সমর-বিশেষজ্ঞরা। যদিও একইসঙ্গে সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত জানিয়েছেন ভারত এখনও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আশাবাদী ও একান্ত প্রয়োজন না হলে যুদ্ধে যাবে না।

তিনি ওইদিন নিউজ এক্স গেনেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন--- 'পাকিস্তান কিংবা চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার কথা মাথায় রেখে

আমাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আমাদের সেনাবাহিনী যে-কোনো মূল্যে তাদের কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর, যে-কোনো ধরনের রাজনৈতিক চাপকে উপেক্ষা করেই।'

জেনারেল রাওয়াত এও মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত বরাবর সেনাবাহিনী প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা জুড়ে সৌহার্দ্যের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি জানান ৩ জানুয়ারি প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় চার সীমান্তের জওয়ানরা এক বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। তাঁর কাথায়— 'এর ফলে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারব। এর ফলে আমরা ও আমাদের প্রতিবেশি দেশের নাগরিকরা একইভাবে উপকৃত হবেন। এবং এটাই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্যের জায়গা। আমরা যুদ্ধের পরিবর্তে এখনও চীনের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কে বিশ্বাসী।

প্রসঙ্গত, গত মাসে অবসর নেওয়ার আগে ভারতের বায়ুসেনাপ্রধান এয়ারমার্শাল অরূপ রাহা জানিয়ে গিয়েছেন কেউ ভয় দেখালে পাল্টা ভয় দেখিয়ে শত্রুভাবাপন্ন দেশকে জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। সুতরাং চীনের হুমকির বিরুদ্ধে এবার চোখে চোখ রেখেই কথা বলার সিদ্ধান্ত ভারত নিয়েছে।

এখনই রেললাইনের সংস্কার চান রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একের পর রেল দুর্ঘটনায় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু যারপরনাই ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ। তিনি অবিলম্বে রেলের ট্র্যাক সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে কানপুরের কাছে পরপর দুটি রেল দুর্ঘটনায় উদ্বিগ্ন রেলমন্ত্রী বলেন, 'আমি ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যেই সমস্ত আধিকারিককে রেলওয়ে ট্র্যাকে নিয়মিত নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছি।' রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গেছে, রেল দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য মন্ত্রক যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আধুনিকতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়। রেলওয়ে ট্র্যাকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিচ্যুতিও যাতে আগাম ধরা পড়ে তার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। সুরেশ প্রভু আরও বলেন, 'মানুষের নিরাপত্তায় খরচ করার জন্য সরকারের কাছে টাকার অভাব নেই। আমরা ইতিম্যেধ্যেই বিশেষ অনুদানের জন্য আবেদন করেছি এবং নীতিগত কারণে অর্থমন্ত্রক তা মেনেও নিয়েছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কানপুরের কাছে শিয়ালদহ-আজমেঢ় এক্সপ্রেসের ১৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়। কেউ মারা না গেলেও ৬২ জন যাত্রী আহত হন।

জনজাতির ধর্মান্তরকরণ নিয়ে সঙ্ঘের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করার জন্য সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত খ্রিস্টান সংগঠনগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন! ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে পোপের উক্তি মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, 'পোপ একবার বলেছিলেন তাঁরা সমগ্র ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছেন। এরপর এশিয়ার পালা।' সরসঙ্ঘচালকের প্রশ্ন, এশিয়ার কোনো দেশ কি আদৌ খ্রিস্টান হতে চায়? চীন কমিউনিস্ট দেশ। তাই তারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে। চীন কি রাতারাতি খ্রিস্টান হয়ে যাবে? পশ্চিম এশিয়ার ইসলামিক দেশগুলিও হবে না। তাই ওদের নজর ভারতের দিকে।' কিন্তু ধর্মান্তরকরণের মাধ্যমে ভারতীয়দের প্রতারিত করা যে ঐতিহাসিকভাবে অসম্ভব সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি জানান গত ৩০০ বছর ধরে লাগাতার চেষ্টা করা সত্ত্বেও খ্রিস্টান সংগঠনগুলি এখনও পর্যন্ত মাত্র ৬ শতাংশ মানুষকেই ধর্মান্তরিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেন, 'ভারতকে ধর্মান্তরিত করার মতো শক্তি ওদের নেই।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জনজাতি অধ্যুষিত গুজরাটের বাঁশদা তালুকায় আয়োজিত একটি সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে মোহন ভাগবত একথা বলেন।

উবাচ

"ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ জার্মানির কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক।"

জাতির উদ্দেশে নববর্ষের ভাষণে।

অ্যাঞ্জেলা মার্কেল
চ্যান্সেলর জার্মানি

"সেনা শক্তি প্রয়োগে কুণ্ঠিত হবে না।"

সাউথ ব্লকে গার্ড অব অনারের পর।

জেনারেল রাওয়াত
ভারতের সেনাপ্রধান

"কোনো কম্পিউটারই নিরাপদ নয়।"

ইউএসএ হ্যাকিং প্রসঙ্গে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প
প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা

"আমি চাই দেশকে দুর্নীতি আর কালোটাকা থেকে মুক্ত করতে। তাই বিরোধীরা চায় আমাকেই হটিয়ে দিতে।"

সাম্প্রতিক নোট বাতিল-বিতর্কে বিরোধীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

"নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঠিকমতো রূপায়িত হলে ভারতীয় অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবে। সব থেকে বড়ো কথা, সরকার যেভাবে দক্ষ হাতে পরিস্থিতি সামলাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়াতেও ব্ল্যাক মানির সমস্যা রয়েছে। ভারতকে দেখে আমরাও ভাবছি অস্ট্রেলিয়ায় এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কিনা।"

হরিন্দার সিধু
ভারতে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রদূত

সাম্প্রতিক নোট বাতিল-বিতর্কে বিরোধীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক নোট বাতিল-বিতর্কে বিরোধীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে।

শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছে দাদার কীর্তি পার্ট টু

মাননীয় তাপস পাল

অভিনেতা, সাংসদ, ধর্ষণ নির্দেশক, চন্দননগরের মাল...

দাদা, আপনার অনেক পরিচয়। আপাতত কয়েকটা দিলাম। ঠিকানা দেওয়া গেল না, কারণ, তা আপাতত অনিশ্চত। আপনি এখন রাজ্যের নতুন মদন মিত্র। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার আগে স্থায়ী ঠিকানা মেলা মুশকিল। ইতিমধ্যেই আপনার গায়ে প্রভাবশালী তকমা লেগে গিয়েছে। তাছাড়া, আপনার প্রভাব তো কম নয়! আপনি নিজেই তো প্রকাশ্যে বলেছিলেন, আপনার নির্দেশে তৃণমূল কংগ্রেসের ছেলেরা বিরোধীদের ঘরে ঢুকে মা-বোনেদের রেপ করে দিতে পারে।

এখন তাই আপনার গ্রেপ্তারিতে কারও দুঃখ নেই। কেউ বলেছেন, 'ঘরে ছেলে ঢোকানোর আগে নিজেই ঢুকে পড়ল, কেউ আবার বললেন 'এর পর চপ্পল পিসির পালা।' মোদ্দা কথা, দাদার কীর্তিতে ফেসবুক থেকে টুইটার এখন টগবগ করে ফুটছে। আসলে আপনি রোজভ্যালির টাকা খাওয়ার অভিযোগে শ্রীঘরে গেলেও সবাই এখন ছেলে ঢোকানো মামলাতেও আপনাকে জেলে দেখতে চাইছে। কিন্তু সেটা হবে না। কারণ আপনার দিদি এবং তাঁর সিআইডি আপনাকে সাত খুন মাফ করে দিয়েছে আগেই।

যাই হোক, সেই দিনটা মনে আছে তো দাদা! ২০১৪ সালের জুন মাস। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখেছিলাম, শুনেছিলাম কৃষ্ণনগরের সাংসদ তাপস পালের সেই বক্তৃতা। আহা, সে কী ভোলা যায়! তৃণমূল সাংসদ নিজের নির্বাচনী এলাকার চৌমথাতে সিপিএম-এর সমর্থকদের হুমকি দিচ্ছেন। গ্রাম্য সভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, 'একটা কোনো সিপিএম যদি আমার মা, বোন, চাচা-চাচি, কারও গায়ে হাত দেয়, এই তাপস পাল ছেড়ে কথা বলবে না। তাপস নিজের রিভলবার বের করে গুলি করে দিয়ে চলে যাবে। জেনে রাখবেন আমি চন্দননগরের মাল... একটা যদি কোনো বিরোধী আজকে তৃণমূলের কোনো মেয়ে, কোনো বাপ, কোনো বাচ্চার গায়ে হাত দেয়, আমার ছেলেদের ঢুকিয়ে দেব। রেপ করে চলে যাবে।'

পুলিশ কিস্যু করেনি। কারণ আপনি দলের কাছে মানে দিদির কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। আসলে দিদিই তো সব। তিনি মাপ করে দিলে আর কার কী বলার থাকে!

মনে আছে তাপস দা, ২০১১-১২ সালে সাংসদ হিসেবে আপনি নিজেই সেবি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। সেই চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি অর্থলগ্নি সংস্থার নামে অভিযোগ করেছিলেন কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে রোজভ্যালির নাম সেখানে লেখেননি। অথচ এ রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরেই রোজভ্যালি বাজার থেকে টাকা তুলেছে। অন্যান্য অর্থলগ্নি সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেও কেন রোজভ্যালির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাননি? এর পিছনে কি কোনো স্বার্থ কাজ করেছিল? রোজভ্যালি বাজার থেকে টাকা তুলছে, সেই খবর আপনি জানতেন না, এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফলে কার্যত নিজের অস্ত্রেই আপনি ফাঁদে পড়েছেন।

আপনি বেশ কয়েকমাস রোজভ্যালির ফিল্ম ডিভিশনের ডিরেক্টর পদে ছিলেন। আপনার স্ত্রী নন্দিনীও রোজভ্যালি সংস্থার একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু পাকা অভিনেতা আপনি নন। দিদির থেকে অভিনয়টা শেখা উচিত ছিল। একই নামে কেউ চার-পাঁচ রকমের সই করে? রোজভ্যালি চেয়ারম্যান গৌতম কুণ্ডুর সঙ্গেও আপনার দহরম-মহরম সম্পর্ক তো সবার জানা।

যাক, জেলে বা সিবিআই হেফাজতে সাবধানে থাকবেন। ভুলভাল বলবেন না। ভুলেও দিদির নাম বলবেন না। কোনো দাদার নামও নয়। মনে আছে তো দিদির নাম বলার জন্য মুকুল রায়কেও নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। এখনও নির্বাসনে কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, শঙ্কুদেব পণ্ডা, শুভাপ্রসন্নরা। সুতরাং যাই বলুন, দিদির নাম একেবারে বলবেন না। দিদির ভাইপোর নামও নয়। দিদি কিন্তু সব খোঁজ রাখেন।

আর হ্যাঁ। সুদীপদা বা শতাব্দী রায়ের সঙ্গে জেলে দেখা হলে ওঁদেরও এটা মনে করিয়ে দেবেন প্লিজ।

—**সুন্দর মৌলিক**

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার লড়াইটা এবার মায়াবতী বনাম বিজেপি-র

পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকে বলিউডে তৈরি পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা নিয়ে পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্বের অতি নাটকীয় সিনেমা নিয়মিত দেখানো হতো। চড়া পর্দার সংলাপ, মন্থরার কুমন্ত্রণা, গৃহকর্তার বাড়ি থেকে পুত্রের বিতাড়ন ইত্যাদি নিয়ে দর্শকের চোখের জল এবং সব শেষে পিতাপুত্রের মিলন। এই অতি পরিচিত সোপ অপেরা বর্ষ বিদায়ের দিন সারা দেশের মানুষ টিভিতে দেখলেন। লক্ষ্ণৌতে মঞ্চস্থ সোপ- অপেরাটিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য স্বর্ণপদক দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে। রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে সমাজবাদী পার্টির জনক মুলায়ম সিং যাদবকে ভারতের বর্ষসেরা রাজনৈতিক অভিনেতার সম্মান জানানো হবে। উঠতি প্রতিভাবান অভিনেতা অখিলেশ যাদবকে মানপত্র দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় অমর সিং, শিবপাল যাদব, রামগোপাল যাদবের নামও আছে। তবে 'নেতাজী' মুলায়ম যে একজন দক্ষ রাজনৈতিক অভিনেতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রাজনৈতিক মহলের অনুমান যে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে সহানুভূতির হাওয়া তুলতে এমন একটা জমজমাট নাটকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নাটক দেখে রাজ্যের মানুষের সহানুভূতি কুড়োতে ব্যর্থ হলেও মুলায়ম-অখিলেশ জুটি এবার বিজেপিকে আটকাতে কংগ্রেস-আর এল ডি-জেডিইউ-আরজেডিকে নিয়ে মহাজোট গড়তে অনেকটাই সফল হয়েছেন। সমাজবাদী পার্টির একা নির্বাচনে জিতে আসা সম্ভব নয়। কংগ্রেস এবং আর জে ডি নেতা লালুপ্রসাদ ইতিমধ্যেই সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অখিলেশকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অখিলেশের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন দু'চারটে আসনে তৃণমূল প্রার্থী দাঁড় করাতে। পশুর মৃতদেহ ছিঁড়ে খেতে ভাগাড়ে যেভাবে শকুনের দল ভিড় করে অনেকটা সেভাবেই এইসব নেতা নেত্রীরা মহাজোটে ভিড় করেছে।

উত্তরপ্রদেশে ভোটের হাওয়া কোন দিকে বইছে এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ইন্ডিয়া টুডের সমীক্ষা বলছে, রাজ্যে এবার ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হতে চলেছে। কোনো দলই পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। যেমন, বিজেপি পেতে পারে ১৭০ থেকে ১৮৩টি আসন।

গূঢ় পুরুষের কলম

মায়াবতীর বিএসপি ঝুলিতে আসতে পারে ১১৫ থেকে ১২৪টি আসন। মুলায়ম-অখিলেশের মহাজোট পেতে পারে ৯৪-১২৪টি আসন। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় মোট আসন আছে ৪০৩টি। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য চাই কমপক্ষে ২০২টি আসন। ইন্ডিয়া টুডের সমীক্ষা অনুসারে কোনো দল বা জোটই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা পাচ্ছে না। অর্থাৎ ত্রিশঙ্কু বিধানসভা এবং আবার নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না উত্তরপ্রদেশে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হবে। উত্তরপ্রদেশের ভোটদাতারা যথেষ্ট সচেতন। তাঁরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকে মাথায় রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন। রাজ্যে ক্ষমতাসীন অখিলেশের সপা সরকারের আমলে আইনশৃঙ্খলার যে পরিমাণ অবনতি হয়েছে তাতে মানুষ ক্ষুব্ধ। মুলায়ম-অখিলেশ যতই নাটক করুন না কেন উত্তরপ্রদেশের ভোটদাতারা তাঁদের অভিজ্ঞতার নিরিখে ভোট দেবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

এবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে মুসলমান-দলিত জোট সাধারণভাবে মায়াবতীর বিএসপির ঝান্ডার দিকে ঝুঁকবে বলে মনে হচ্ছে। তিন তালাক এবং গোহত্যার অবাধ অধিকার মুসলমানদের থাকবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিএসপি মুসলমান ভোটারদের কাছে টানার চেষ্টা চালাচ্ছে। মায়াবতী মুসলমান ও দলিতদের রক্ষক এই বিশ্বাস জাগাতে পারলে সপার ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে। যার সঙ্কেত ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। তাতে বিজেপির বিশেষ ক্ষতি দেখছি না। উত্তরপ্রদেশের রাজনীতির খবর যাঁরা রাখেন তাঁদের অজানা নয় যে মুসলমানরা দলবদ্ধভাবে যে দলের দিকে যাবে তার উল্টো দিকে হিন্দুদের ভোট সংহত হবে। বিধানসভার লড়াইটা তাই এবার মায়াবতী বনাম বিজেপির হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ এবং ঠাকুরদের ১৮ শতাংশ ভোট বিজেপির ঝুলিতেই পড়ে। সেটা নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কুরমি, লোধ এবং কুশওহা ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিও বিজেপিকে তাঁদের রক্ষক দল হিসেবে সমর্থন করেছে। কুরমিরা উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম অনুন্নত সম্প্রদায়। রাজ্যের প্রতাপগড়, ফুলপুর, এলাহাবাদ, বস্তি, বান্দা, মিরজাপুর এবং বারাণসী এলাকায় কুরমিদের সমর্থন ভোটপ্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করে। লোধারা হচ্ছে রাজ্যের তৃতীয় বৃহৎ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়। উমা ভারতী, কল্যাণ সিং এই সম্প্রদায়ের নেতা। লোধ-রা বিজেপির ঝুলিতেই হাত ভরে ভোট দিয়েছেন। কোনোদিনই মুখ ফেরাননি।

সংখ্যার হিসেবে কম হলেও অনুন্নত সম্প্রদায় কুশওহা ভোটদাতারাও বরাবরই বিজেপিকে তাঁদের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। রাজ্য বিজেপিতে মায়াবতীর ক্যারিশ্মার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কেউ নেই। এমন নেতা বা নেত্রী যাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভোটের ময়দানে সর্বজনগ্রাহী বলে তুলে ধরা যায়। বিহারে বিজেপি ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ দলের পক্ষ থেকে কাউকে মুখ্যমন্ত্রীর পদের প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রে সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল দলের পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার বলে আগাম ঘোষণা। ভারতের সাধারণ মানুষ উন্নয়ন চায়। মোদী ছিলেন গুজরাটের উন্নয়নের মুখ। সাফল্য এসেছিল উন্নয়নের স্বার্থে। ■

স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষে আজও জাগে শিহরণ

ড. জিষ্ণু বসু

‘হে বীর অগ্রসর হও। শৃঙ্খলে আবদ্ধ যারা তাদের মুক্ত করার জন্য। দুঃখভারে নুব্জপৃষ্ঠ যারা তাদের দুঃখ লাঘব করার জন্য অগ্রসর হও।...’ ভারতবর্ষের তরুণ সমাজের কাছে এই ডাক দিয়েছিলেন স্বামীজী। বলেছিলেন, অজ্ঞানতার অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত আছে তাদের হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য এগিয়ে এসো। হে বীরের দল নির্ভয়ে এগিয়ে এসো। আর তিনি এটাও বললেন যুব হৃদয়ে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, সত্যের জন্য নিঃস্বার্থ বুদ্ধিতে কাজ করার প্রেরণার উৎসও প্রোথিত আছে আমাদের শাশ্বত সংস্কৃতিতে। হিন্দু সভ্যতার বিশ্ববিজয়ের মূল মন্ত্রের কথা বললেন স্বামী বিবেকানন্দ। বললেন, বেদান্ত ডঙ্কানিনাদে ঘোষণা করছে, ‘অভিঃ’ অর্থাৎ নির্ভয় হও। ঈশ্বরের ‘এই পবিত্র কণ্ঠস্বর জগতের সব দুঃখ দূর করতে সমর্থ’।

ভারতবর্ষের যুবসমাজ এক মহামন্ত্র পেল। এমন একজন গুরু পেল যিনি মনুষ্যত্বের সহজ পাঠটা একেবারে সাদামাটা ভাষায় বললেন— ‘মানুষ হয়ে যখন জন্মেছিস তো একটা দাগ রেখে যা।’ ‘দাগ রেখে যা’ মানে? মানেটা একদম পরিষ্কার করে বলেছেন। ‘আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্‌হিতায় চ’— নিজের আত্মিক উন্নতি, মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা, আর জগদ্‌বাসীর কল্যাণ করা। আর্তজনের সেবা করার কথা। শিব জ্ঞানে জীবসেবা করা। একেবারে আটপৌরে ভাষায় বক্তব্য— ‘কেবল নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি? বাঁচব তো পরের জন্য বাঁচব। আমি পৃথিবীতে আসার সময় পৃথিবীটা যেমন ছিল তার থেকে একটু হলেও সুন্দর করে তবে পৃথিবী থেকে বিদায় নেব। আর এই কাজটা যদি আমার জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে আমার মধ্যে অনন্ত অসীম শক্তি সম্ভাবনা আছে। কারণ মানুষ তো স্বরূপত ব্রহ্ম। অনন্ত ক্ষমতাধারী সর্বব্যাপী মহাশক্তি সেই ঈশ্বর। মানুষ তাঁর শক্তির প্রকাশমাত্র। আর এই যুবশক্তির উন্মেষের ফলও তিনি বলে গেছেন। কন্যাকুমারীতে তিন সমুদ্রের মাঝে সেই শিলাখণ্ডের উপর তিনদিন তিনরাত্রি স্বামীজী ধ্যান করেছিলেন। ধ্যান করেছিলেন কোনো লোকায়ত দেবতাকে নয়, জীবন্ত জাগ্রত দেশমাতৃকাকে। তিনি দিব্যচক্ষে দেখলেন আমাদের এই প্রাচীনা জননী আগের থেকে আরো মহিমান্বিত হয়ে জগৎসভায় প্রকাশিত হয়েছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর আসন লাভ করবে এটাই ছিল মাত্র উনচল্লিশ বছর বেঁচে থাকা যুবক সন্ন্যাসীর চোখের স্বপ্ন। ভারতবর্ষ পরম বৈভবশালী হবে।

এই স্বপ্ন যুবমানসে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী অন্য গুরুদের মতো অত্যাশ্চর্য দৈবক্ষমতার কথা বলেননি। বলেননি কোনো গোপন গুহ্য বিদ্যার কথা। কোনো ম্যাজিক দেখাননি। বলেছেন, ‘আমি করেছি, তুমিও করতে পারবে।’ এই সরল কথাটা সেযুগে যুবমনে ম্যাজিক এনেছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবজাগরণের মূল কাণ্ডারি স্বামী বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন আসলে ভারতবর্ষের যুবশক্তির জয়যাত্রা।

স্বামীজী বললেন, ‘আগামী পঞ্চাশ বছর তোমাদের লোকায়ত দেবদেবীকে ভুলে থাকলেও চলবে। এই বছরগুলিতে তোমাদের একমাত্র উপাস্য হোক জননী জন্মভূমি ভারতবর্ষ।’ ‘বর্তমান ভারত’ প্রবন্ধের শেষে বিবেকানন্দ দেশের যুবকযুবতীদের দিলেন স্বদেশমন্ত্র। ‘ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর’ কিংবা ‘ভুলিও না তোমার ঐশ্বর্য, তোমার ধর্ম যাবতীয় ইন্দ্রিয় সুখ আপনার ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়’, এইসব বীরবাণী পরাধীন দেশের যুবকদের স্নায়ুর

“মানুষ যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়, তবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে যদি বিশ্বের সব সম্পদ ঢেলে দেওয়া হয় তাহলেও তার উন্নতি সম্ভব নয়।”

প্রতিটি তন্ত্রীতে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে তুলল। যে ভারতবর্ষকে শৈশবের শিশুশয্যা, যৌবনের উপবন বলেছেন স্বামীজী তার হতদৈন্য দশায় ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবকের হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল। তিনি বলেছেন, 'তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, আমি ভারতবাসী...'। তাই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা হয়ে উঠল অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। সেযুগে দেশের কোণে কোণে এমন সর্বত্যাগী, দেশভক্ত যুবক দেশমাতৃকার জন্য বলি প্রদত্ত হতে ধন, সম্পত্তি, পরিবার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। পরাধীন দেশের সেই রাজদ্রোহীদের যখন পুলিশ তাড়া করেছে, রাতের অন্ধকারে ছুটছে সে যুবক। কাঁটাবন, পাথরে ভরা পথ, দুর্যোগভরা প্রকৃতি, ছুটছে সে যুবক। হয়তো অন্ধকারে পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছে সেই টগবগে ছেলেটা। আর বুকে জড়িয়ে ধরা লাল শালুতে মোড়া দুটো বই মাটিতে ছিটকে গেল। পুলিশের জোরাল টর্চের আলোয় দেখা গেল সেই বই দুটি। একটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আর অন্যটি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। সে যুগের ইংরেজ পুলিশের কাছে জার্মান বোমা বানানোর ফরমুলার থেকেও বেশি বিপজ্জনক ছিল এই বই দু'টি।

স্বামীজী বলেছিলেন, তাঁর চাই মাত্র একশোজন যুবক। যাদের পেশী হবে ইস্পাত নির্মিত, স্নায়ু হবে বজ্রসম আর ভিতরে এমন একটা মন থাকবে যা দিয়ে দেশের দরিদ্রতম মানুষটির দুঃখও সে বুঝতে পারে। স্বামীজী তার দক্ষিণ ভারতীয় ভক্ত আলাসিঙ্গাকে বলেছিলেন তাঁর সেই স্বপ্নের সংগঠনের কথা। তিনি বলেছিলেন তাঁর সেই সাধের সংগঠন তৈরি হবে মধ্যভারত থেকে। স্বামীজীর তিরোধানের কয়েকবছর পরেই ভারতের একেবারে মধ্যবিন্দু নাগপুর থেকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এলেন এক যুবক। ডাক্তারি পড়াটা ছিল ছুতো। আসলে তখন দেশভক্ত বিপ্লবীদের স্বর্গ ছিল কলকাতা। তাঁদের কাছ থেকে বিপ্লবের পাঠ নিয়ে মধ্য ভারতের সঙ্গে সংযোজক হিসেবে কাজ করার পরিকল্পনা ছিল নাগপুরের কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কেশব মজে গেলেন আরেক ত্যাগের কর্মযজ্ঞে। ১৯১৯ সালে দামোদরে এল ভয়াবহ বন্যা। সেই বন্যাতে নতুন তৈরি সংগঠন রামকৃষ্ণ মিশন প্রাণপাত করে সেবা করা শুরু করল। সেই সেবাকাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মরাঠি যুবক কেশব। তাঁর এক সহযোগী তাঁর কথা লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, কেশব সেবাকাজে দিনরাত এক করে ফেলত। সেই কেশব নাগপুরে ফিরে গিয়ে তৈরি করলেন স্বামীজীর স্বপ্নের সংগঠন ১৯২৫ সালে। তাঁর তৈরি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিগত ৯০ বছর ধরে স্বামীজীর সাধের মানুষ তৈরির সাধনা করে চলেছে। আজও শাখার মাঠে শত সহস্র বালক, কিশোর, তরুণ প্রতিদিন বুকে হাত রেখে যখন প্রার্থনা করে— 'পরমবৈভবংনেতু মেতৎ স্বরাষ্ট্রম্' তখন তাদের চোখেও উদ্ভাসিত হয় স্বামীজীর স্বপ্নে দেখা সেই প্রাচীনা দেশজননী যিনি অচিরেই ও পূর্বাপেক্ষা মহিমান্বিতা হয়ে প্রকাশিত হবেন।

স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এক দৃঢ় প্রত্যয় এনে দিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষে বাংলা-সহ সমগ্র ভারতবর্ষে একরকম হতাশা ও দারিদ্র্যের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের মানুষ বিশ্ববাসীর কাছে কেবল ভিক্ষার পাত্র হাতে যেতে পারবে। আর ইংরেজের ও ফরাসিদের অনুগ্রহে ভারতের মানুষ বেঁচে থাকবে। সেই লজ্জাকর কাপুরুষতার দেশ থেকে একজন গৈরিক পোশাক পরিহিত যুবক সাত সমুদ্র পেরিয়ে আধুনিক বিশ্বের প্রতীক আমেরিকার বুকে গিয়ে বোমা ফাটালেন। বললেন, 'তোমরা সাহেবরা যখন গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে তখন ভারতের মানুষ সভ্যতার পথে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে'। আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি, ভাষা, সংস্কৃতি, গাত্রবর্ণ সব মিলে যে মানব সমাজ তার সবাইকে নিয়ে বেঁচে থাকার ফরমুলা আছে তা কেবল ভারতের হিন্দুদের কাছে। এই সংস্কৃতিতে 'এক্সক্লুশন' বা বর্জন শব্দটাই নেই। হিন্দুরা পরধর্ম, পরমত শুধু সহ্যই করে না, বহন করে নিয়ে চলে। তাই পৃথিবীকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মন্ত্র ভারতবর্ষই শেখাতে পারে। তাই পৃথিবীর মানুষকে ভারতবর্ষের যা দেবার আছে তা এক কথায় অমূল্য। ভারতের মাদ্রাজ থেকে শ্রীনগর, গুয়াহাটি থেকে করাচীর যুবকদের হৃদয় সেদিন ভরে গিয়েছিল। আমরা তবে ভিক্ষুকের জাত নয়। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধতঃ'— স্বামীজীর এই মন্ত্রে সেদিন জেগে উঠেছিল ভারত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সাহিত্যে সবক্ষেত্রে জেগে উঠল এই জাতি। যদি আমরা স্বাধীনতার ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে থেকে দেখি, তবে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ও জ্ঞানের অন্যান্য ধারাতে ভারতের যে সাফল্য তা বিগত কয়েক শতকে দেখা যায়নি। আজ যখন আমেরিকা বা ফ্রান্সের কোনো নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী গল্প করতে গিয়ে বলেন যে, একটা ক্ষেত্রে গত শতাব্দীতে ভারতের অবদান অসাধারণ— সেটা হলো পার্টিকেল ফিজিক্স, তখন খুব মজা লাগে। কারণ ওই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রমন বা মেঘনাদ সাহার অবদান জানেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথা, নেতাজী সুভাষের বীরত্বের কাহিনি শোনেননি। আসলে এইসব অনবদ্য সাফল্যে আছে এক অদম্য আত্মশক্তি, সেটা জাগিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৯০০ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে তরুণ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় অভিভূত হয়েছিলেন স্বামীজী। সেই শুরু। জগদীশচন্দ্রের পরবর্তী জীবনের বেশিরভাগটাই জুড়ে ছিলেন স্বামীজী। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের পরে ভগিনী নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞানী সপত্নীক বহুদিন ছিলেন নিবেদিতার উইম্বলডনের পৈত্রিক বাড়িতে। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের ভাষা সংশোধন করতেন নিবেদিতা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। জগদীশচন্দ্র বসুকে আদর করে খোকা বলতেন নিবেদিতা। আজ ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষে মনে হয়, এত বছর আগেও তিনি ব্যাঙ্গালোরে ভারতের প্রথম বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন।

সেদিন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সুব্যবস্থিত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র তৈরির জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা। জামসেদজী নাসেরওয়ানজী টাটা ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দকে একটি চিঠি লেখেন : 'ভারতের যুব সমাজের মধ্যে থেকে যাতে বিজ্ঞানের সাধক উঠে আসে তার জন্য চাই প্রাচ্যের ধ্যেয়নিষ্ঠা। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধকদের জন্য আমি একটি বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র করতে চাই,

আপনিই হবেন তার অধিকর্তা, যোগ্যতম নেতা।' স্বামীজী সে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। নিবেদিতা কলকাতা ও লন্ডনে সব মিলিয়ে চারটি বৈঠক করেন ইংরেজ আধিকারিক ও টাটাদের সঙ্গে। তৈরি হয় টাটা ইন্সটিটিউট যার আজকের নাম ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স। নিবেদিতা চেয়েছিলেন ওই সংস্থার প্রথম অধিকর্তা হোন তাঁর 'খোকা' স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। কিন্তু ইংরেজ সরকার ইউরোপীয় ছাড়া কাউকে সেই সম্মান দিতে রাজি হয়নি। তাই নিবেদিতার আগ্রহে কলকাতায় তৈরি হলো 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। আজ যেটি ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের এক জাতীয় সংস্থা— বোস ইন্সটিটিউট। সেই জাতীয় সংস্থাটির আজকেরও প্রতীক নিবেদিতার নকশা করা বজ্র চিহ্ন, যা দধীচির আত্মদানের প্রতীক। নিবেদিতা মনে করতেন দেশ গঠনের জন্য যুবকদের দধীচির মতো আত্মবলিদানের মানসিকতা থাকা প্রয়োজন। সেদিন ইংরেজ জগদীশচন্দ্র বসুকে প্রকৃত সম্মান না দিলেও আজ কিন্তু সারা পৃথিবী নতমস্তকে স্বীকার করে তাঁর অবদান। আজ আধুনিক যুগের যা কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টিভি, রেডিও, কম্পিউটার, মোবাইল, মাইক্রোওয়েভ ওভেন এর সব কিছুর পিছনে একটি আবিষ্কার তা হলো 'মাইক্রোওয়েভ', যার আবিষ্কারক নিবেদিতার 'খোকা' জগদীশচন্দ্র বসু।

বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পৃথিবীতে যুগান্ত এনেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝে যায় যে কোনো প্রাচীন সভ্য দেশকে মেকি সুসভ্যতার নামে আর দাসত্ব করানো যাবে না। স্বামীজীই বিশ্বসভায় প্রথম 'প্লুরালিজম্' বা 'বহুমত সিদ্ধতার' কথা বলেন। কোনো একটিমাত্র ধর্মমত টিকে থাকবে আর সব বিলীন হয়ে যাবে— এই 'সেমেটিক' ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেন তিনি। সেই শুরু। তারপর দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। আজ কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষিত নীতিই হলো এই 'প্লুরালিজম্'। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়াটাকেও নতুন করে সাজিয়েছেন সেই যুব বীরসন্ন্যাসী। এই কথাটা আজ আমাদের অদ্ভুত লাগে এই জন্যই যে, এ বাংলায় স্বামীজীর অবদানকে ভুলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস চলেছে বিগত কয়েক দশক ধরে। পাঠ্যপুস্তকে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লেখায়, রাজনীতির বক্তৃতায় আবার সেই 'পরজাতি নিষ্ঠিবনে অবগাহন' করার পৈশাচিক প্রয়াস চলেছে স্বাধীনতার পর থেকে। এখানের সব মত, সব পথ, সব মনীষী-মহাত্মা উপেক্ষা পরিহাসের যোগ্য— এই ভয়ানক রাজনৈতিক সামাজিক চিন্তা বাংলার যুবসমাজকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে।

এলিয়েনা স্টেন এক মার্কিন যুবতী। গত শতাব্দীর আটের দশকে একটি বই লেখেন— 'দ্য গিফ্ট্ আন ওপেনড'--- আমাকে ভালোবেসে আমার জন্মদিনে কেউ একজন একটি উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কারণে সেটি আর খোলা হয়নি। অযত্নে অবহেলায় তা পড়ে ছিল বহুদিন না খোলা অবস্থায়। বহু বছর পরে হঠাৎ খুলে দেখা গেল যে ওই মানুষটা আমাকে কতটা ভালোবাসে। আমার সম্পর্কে কতটা ভেবে অমন একটা উপহার দিয়েছিলেন। সেদিন আমি তা খুলেও দেখেনি।' এলিয়েনার মতো স্বামী বিবেকানন্দের বার্তা পশ্চিমের কাছে তেমনই একটা উপহার ছিল। পশ্চিম অবহেলায় খুলে দেখেনি, তাই কি আজ তারা এমন দেউলিয়া?

এলিয়েনার কথাটা যেন ভারতের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে সত্যি। যে যুবশক্তির জাগরণে উদ্বেল হয়েছিল পরাধীন ভারত, ঘটিয়েছিল অসাধ্য সাধন— স্বাধীন ভারত কি স্বামীজীর সেই আহ্বান ভুলে যায়নি? স্বামীজী বলেছিলেন, 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা ঠিক নয়।' স্বাধীনতার পর থেকে ধীরে ধীরে এই সততা সমাজ থেকে তিরোহিত হয়। সরকারি চাকরি পাওয়া ৩৪/৩৫ বছরের এক যুবক, গলায় মোটা সোনার চেন পরে এক ৬৫ বছরের অসহায় বৃদ্ধার ফ্যামিলি পেনশন পাইয়ে দেবার জন্য অবলীলায় ঘুষ নেয়। একজন যুবক ব্যবসায়ী তার কর্মজীবন শুরু করার পরেই শেখে কীভাবে কর ফাঁকি দিতে হয়।

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধানের একশত বছর পরে ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে তাঁর আদর্শ উদ্ভাসিত হবে। যুব সমাজের মধ্যে বর্তমানে গভীর দেশপ্রেম, স্বাভিমান, আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেখানে কলকাতা, দিল্লির মতো শহরে। কেবল কাশ্মীরের আজাদি বা মণিপুরের আজাদির প্রলাপ বকা অতিবিপ্লবীদের মিছিল দেখা যেত। গত বছর ওই দুটি শহরেই জাতীয় পতাকা নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনে বিরাট বিরাট যুব মিছিল হয়েছে। সারা দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে যুবসমাজ। সম্প্রতি নোটবদল সারা দেশে এই দুর্নীতি, অতিবাম সন্ত্রাস ও মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকদের বড় আঘাত দিয়েছে। এইসব দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডের মূল সহায়ক ছিল জালনোট ও কালোটাকা। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কোনো অজ্ঞাত কারণে লুকিয়ে রেখে আপাত অসুবিধাকে বড় করে দেখানোর এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা করে বৈদ্যুতিন ও মুদ্রণ সংবাদমাধ্যম। সেই সঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু দেশের আপামর যুব সমাজ অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এই অসুবিধার মোকাবিলা করেছে।

স্বামীজী বলেছিলেন--- 'মানুষ যদি আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়, তবে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রামে বিশ্বের সব সম্পদ ঢেলে দেওয়া হলেও তার উন্নতি সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'স্টার্টআপ' প্রকল্পে এই আত্মশক্তির বিকাশের এক প্রকৃষ্ট প্রয়োগের সুযোগ হয়েছে। ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত কোনো শিল্প প্রকল্প আজকের যুবক যুবতীরা তৈরি করতে পারবে। এর জন্য iMADE নামের একটি বিশেষ অ্যাপ্‌সও তৈরি করেছে। তপশিলি জাতি ও উপজাতি যুবশক্তির বিকাশসাধন করে উৎপাদন ও বাণিজ্যের পথে উৎসাহিত করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। গ্রামীণ ক্ষেত্রে 'স্টার্টআপ' কর্মসূচির নাম 'দীনদয়াল উপাধ্যায় স্বনিয়োজন যোজনা'। যুব উদ্যোগপতিদের উৎসাহিত করার জন্য এই যোজনাতে প্রথম ৩ বছর ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এবং লাভের উপর করের থেকেও ছাড় দেওয়া হয়েছে। আজকের ভুবনায়নের যুগে পৃথিবীর উন্নত দেশের উৎপাদনের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাই উপযোগী প্রযুক্তি। তাই এগিয়ে এসেছে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাজ এবং ন্যাশেনাল ইন্সটিটিউট টেকনোলজি শিলচরের মতো প্রযুক্তি সংস্থা। এবছর যুব দিবসে প্রার্থনা— সত্য হোক ভগিনী নিবেদিতার ভবিষ্যদ্‌বাণী— 'ভারত জাগুক তরুণ সন্ন্যাসীর মন্ত্রে। স্বামীজীর স্বপ্নের 'নতুন ভারত বেরুক।' ■

স্বামীজীর স্বপ্নের রূপায়ণে দীপ্যমান যুবজনতার কয়েকজন

সন্দীপ চক্রবর্তী

কোনো জাতির জীবনে এরকম একটি সময় খুব কম ক্ষেত্রেই আসে। এটা সকলেই জানেন ভারতের মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫-এর মধ্যে। কিন্তু বিখ্যাত ফোর্বস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ অনুযায়ী ভারতের ৫০ শতাংশ নাগরিকের বয়স ২৫ বা তার থেকে কম। শিহরিত হবার মতো তথ্য এটাই। আগামী ১০ বছরে ভারতের সম্মিলিত কর্মশক্তি কোন পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তা ভাবলে সত্যিই আশ্চর্য হতে হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একবার চোখ রাখলে ভারতের যুবক-যুবতীদের প্রতিভার স্ফুরণ এবং বিকাশের ক্ষেত্রগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরকমই কয়েকজনের কথা এখানে দেওয়া হলো। এদের মধ্যে কেউ তরুণ ব্যবসায়ী, কেউ ক্রীড়াবিদ, কেউ কবি বা চিত্রপরিচালক, কেউ সেনা অফিসার। স্বামীজীর আদর্শের প্রতিফলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনায় এবং প্রয়োগে দেশ জুড়ে যে ইতিবাচক তরঙ্গ বয়ে চলেছে এরা সকলেই তার অংশীদার।

সুজয় সাঁতরা, স্টার্ট আপ ব্যবসায়ী

সংস্থার নাম আইকিওর। তবে সংস্থাটির সম্পূর্ণ পরিচয় দেবার আগে একটি ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। খড়্গপুরের বাসিন্দা এক ভদ্রলোক হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। স্থানীয় চিকিৎসকেরা বিস্তর চেষ্টা করলেও রোগীর অবস্থার উন্নতি হলো না। বাধ্য হয়ে তাঁর ছেলে তাঁকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য।

সেখানকার চিকিৎসক কয়েকটি পরীক্ষার পর জানালেন এতদিন ভুল চিকিৎসা হওয়ার জন্য রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়নি।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল আইকিওর-এর প্রতিষ্ঠাতা-সিইও সুজয় সাঁতরার নিজের জীবনেই। এমনিতেই ভারতীয় চিকিৎসকদের মাত্র ৩০ শতাংশ ৮৪ কোটি গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসা করেন। গ্রামে বিনা চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসায় মারা যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তাই বলে খড়্গাপুরে? এখান থেকেই নতুন কিছু করার প্রেরণা পেয়েছিলেন সুজয়। ফলস্বরূপ আইকিওর-এর জন্ম। সুজয় বলেন, 'আমরা আইকিওর তৈরি করেছিলাম কম খরচে গ্রামের মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা দেব বলে।' ওয়ারলেস হেল্‌থ ইনসিডেন্ট মনিটরিং সিস্টেম নামক এক সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে আইকিওর প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী রোগীর সঙ্গে নামী চিকিৎসকের এক আশ্চর্য যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। আইকিওর-এর মোবাইলভ্যান পৌঁছে যাচ্ছে রোগীর দরজায়। সেখান থেকে পাওয়া তথ্য চলে যাচ্ছে ডাক্তারবাবুর কাছে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে রোগী দেখে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে অভিনব। গ্রামীণ ভারতের পক্ষে উপযোগীও। সংস্থার সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সুজয় গত দু' বছরে বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলায় ২৮টি রিজিওনাল হেল্‌থ সেন্টার স্থাপন করেছেন। সেখানে ডাক্তার নার্স সকলেই রয়েছেন। রোগীর প্রয়োজন বুঝে এখানে সব ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

রানা দত্ত, সন্দীপ বোধক ও সুনীল মিশ্র, স্বাস্থ্য পরিষেবক

আইকিওরের পর টিয়ো। টিয়ো-ও স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা। মিল রয়েছে আরও একটি জায়গায়। এটিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্টার্টআপ প্রকল্পের অন্তর্গত। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বছরে মাত্র সাতশো টাকার বিনিময়ে যে-কোনো ব্যক্তি টিয়ো-র ওয়েবসাইটে নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য জানাতে পারেন। তার ভিত্তিতে টিয়ো রোগীকে নানান মেডিক্যাল টিপস্ দেবে। এছাড়া, দেশ জুড়ে দু' লক্ষ চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট টিয়োর মাধ্যমে পাওয়া যায়। তার জন্য আলাদা কোনো খরচ নেই। আপাতত কলকাতা, বেঙ্গালুরু, পুনে ও হায়দরাবাদে এই পরিষেবা পাওয়া যায়। কিন্তু শীঘ্রই আরও ১০টি নতুন শহর পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত হবে।

শুভম জাগলান, গল্ফার

তিন বছর আগেকার কথা। ভারতের নামী গল্ফার ননিতালাল কুরেশি বেশ অবাকই হয়েছিলেন। শিশুদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় একটি ছেলে প্রায়শই উঠে আসছিল শীর্ষস্থানে। নাম শুভম জাগলান। কিন্তু সে কোথায় থাকে কেউই কিছু বলতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ননিতা শুভমকে আবিষ্কার করলেন

হরিয়ানার পানিপথ জেলার ইসরানা গ্রামে। দুধ ব্যবসায়ীর ছেলে শুভম ধানক্ষেতে অনুশীলন করে বড়ো হয়েছে। ওদের বাড়িতে গেলেই চোখে পড়বে উঠোনে ছোট ছোট গর্ত। শুভমের গলফ কোর্ট। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় এই সামান্য পুঁজি নিয়ে শুভম সান দিয়েগোতে অনুষ্ঠিত বয়সভিত্তিক (৯-১০ বছর) জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ননিতা জানিয়েছেন, কয়েক

বছর আগে একজন অনাবাসী ভারতীয় ইসরানা গ্রামে বাচ্চাদের উপযোগী একটি গল্ফ কোর্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামের অন্য বাচ্চারা কিছুদিনের মধ্যে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। একজনই শুধু অধ্যবসায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সে শুভম। ননিতা বলেন, 'প্রথমে বাড়ির উঠোন তারপর ধানক্ষেত আর শেষে ওই গলফ কোর্টে শুভম দিনের পর দিন অনুশীলন করেছে। মাত্র দশ বছর বয়েসে ও গলফের যেসব কৌশল আয়ত্ত করেছে দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।'

সন্ধ্যা চৌহান, নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার

রিওয়ারি জেলার কুন্দল গ্রাম। এই গ্রামের কোনো মেয়ে কখনো ভারতীয় নৌবাহিনীতে যোগ দেয়নি। সন্ধ্যা চৌহানই প্রথম। আর যোগ দেবার কয়েক বছরের মধ্যেই বাহিনীর প্যারেডে নেতৃত্ব দেবার ডাক। তাও আবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সম্মানে! অথচ সন্ধ্যার প্রেক্ষাপটটি একবার জেনে নিলে এই সাফল্য রূপকথা বলে মনে হবে। রিওয়ারি গ্রামে মেয়েদের সংখ্যা কম হওয়ায় লিঙ্গবৈষম্যের প্রবণতা যথেষ্ট বেশি। এখানে প্রতি হাজার পুরুষশিশুর অনুপাতে মেয়েরা মাত্র ৭৯৭ জন। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য সন্ধ্যার প্রাথমিক পড়াশোনা গ্রামের

সরকারি স্কুলে। হাইস্কুল এবং কলেজ রিওয়ারিতে। ২০১০ সালে তিনি নৌবাহিনীর সাব-লেফটেন্যান্ট পদে নির্বাচিত হন। সন্ধ্যার পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ধ্যার অনুপ্রেরণার উৎস তাঁর দাদা মেজর দিগ্বিজয় চৌহান। বাবা মহেশ চৌহান মারা যাবার কয়েক মাস আগে ২০০৫ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ধ্যা শুধু পরিবার বা গ্রামকে নয়, সমগ্র দেশকে গর্বিত করে তুলেছেন। গ্রামের সরপঞ্চ লক্ষ্মীনারায়ণ বলেন, 'সন্ধ্যা আমাদের চোখের মণি। যারা মেয়েদের নীচু নজরে দেখে, লেখাপড়া শেখায় না, মেরে ফেলে তাদের কাছে ও একটা দৃষ্টান্ত।

সুমৃত শাহী, লেখক

সুমৃতের সিভিতে একবার চোখ বোলালে তাক লেগে যাবে। মাত্র ১৭ বছর বয়েসে তার প্রথম বই প্রকাশিত হয়। ২০ বছর বয়েসে লেখেন টিভির জন্য প্রথম চিত্রনাট্য। এই মুহূর্তে তিনি দেশের তরুণতম চিত্রনাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। এ যাবৎ প্রকাশিত তাঁর তিনটি উপন্যাস জাস্ট ফ্রেন্ডস, আ লট লাইক লাভ এবং নেভার কিস ইয়োর বেস্ট ফ্রেন্ড। এছাড়া লিখেছেন 'সাড়া হক', 'মিলিয়ন ডলার গার্ল' এবং 'বয়েজ' টিভি সোপের ৭০০ পর্বের চিত্রনাট্য। সুমৃতের উপন্যাস ইতিমধ্যেই হিন্দীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। ২০১৪ সালে সুমৃত ভারতীয় টেলি সম্মান প্রতিযোগিতায় 'সেরা কাহিনিকার' বিভাগে অন্যতম নমিনি ছিলেন।

হরপাল শেখুপুরিয়া, ভাস্কর

হরিয়ানার শেখুপুর গ্রামের হরপাল শেখুপুরিয়ার জন্ম এক শিল্পী পরিবারে। ভাস্কর্যে ব্যাচেলর ডিগ্রিলাভ করেছেন চণ্ডীগড় কলেজ অব আর্ট থেকে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা শান্তিনিকেতনে। এখন তিনি দেশের অন্যতম ব্যস্ত ভাস্কর। সম্প্রতি চণ্ডীগড় ললিতকলা অ্যাকাডেমি স্কলারশিপ দিয়ে তাকে সম্মানিত করেছে।

দেবাশিস দাস, কবি

দেবাশিস কথা বলতে পারেন না। কলমও ধরতে পারেন না। তাঁর মা স্বর্ণময়ী তাঁকে সাহায্য করেন। আত্মপ্রকাশের অনমনীয় জেদে দেবাশিস নিজের ভাবনার রূপ দিয়ে চলেন। প্রকৃতি তার নিজস্ব বর্ণপরিচয়ে ধরা দেয় দেবাশিসের কবিতায়। মানুষের চিত্রবিচিত্র আবেগ তাকে সম্মোহিত করে রাখে। আবার তার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলীও তাকে ভাবায়। নিসর্গমগ্ন উচ্চারণের সঙ্গে তিনি অনায়াসে নির্ভয়াকাণ্ড বা উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ বন্যা নিয়ে কবিতা লিখতে পারেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দেবাশিসের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমার ভাবনায় জন্মভূমি'। মাত্র ২৫ বছর বয়েসি দেবাশিস বন্ধু, পাঠক এবং পরিচিত মহলে অসম্ভব জনপ্রিয়। দেবাশিসের বাবা নিখিলেশবাবু বলেন, 'আমরা ওর নামে একটা ফেসবুক পেজ তৈরি করেছি। সেখানে ওর বন্ধুদের দাবিতে সব কবিতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে।' দেবাশিসের বন্ধুরা চান ওর কবিতা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক। নির্বাক কবির অবরুদ্ধ ভুবন মুক্তি পাক।

অনামিকা গুপ্ত, গ্রাফিক আর্টিস্ট

চণ্ডীগড় কলেজ অব আর্ট থেকে চারুকলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করার পর অনামিকা গুপ্তা আর পিছন ফিরে তাকাননি। গ্রাফিক আর্টিস্ট হিসেবে ইতিমধ্যেই পেয়েছেন নানা সম্মান। তাঁর চর্চার ক্ষেত্র মূলত গ্রাফিক আর্ট এবং ছাপাই ছবি। দেশবিদেশের বহু প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে বিস্তর প্রশংসা কুড়িয়েছেন। গত বছর চণ্ডীগড় ললিতকলা আকাদেমি সাম্মানিক বৃত্তি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। অনামিকা বলেন, 'আমি বরাবর যা পছন্দ করি তাই পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই আমি ছবি আঁকতে ভালোবাসি। গভর্নমেন্ট মডেল সিনিয়র স্কুল থেকে ক্লাস টেনের পরীক্ষায় পাশ করার পর আমি পঞ্চকুলার বামা আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে ভর্তি হই। তারপর অনেক পরিশ্রম করে আজকের এই জায়গাটা তৈরি করেছি।' ২৮ বছরের অনামিকা ভারতের ইতিবাচক পরিবেশকে তার সাফল্যের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। নির্দ্বিধায় বলেন, 'এখন ভারতীয় যুবসমাজের সামনে অনেক রাস্তা। সাফল্যের জন্য মাথা খোঁড়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। যে দিকেই যাই না কেন আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন এমন কাউকে-না-কাউকে পেয়ে যাব।' অনামিকা চিন্তাভাবনায় মৌলিক থাকার চেষ্টা করেন। স্বপ্ন দেখেন গ্রাফিক আর্টের অগ্রগণ্য শিল্পী হয়ে ওঠার।

আথার আমির শাফিখান, কনিষ্ঠতম আই এ এস অফিসার

এ বছর জম্মু ও কাশ্মীর থেকে মোট দশজন পরীক্ষার্থী সিভিল সার্ভিস (আইএএস) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে একজন সারা দেশকে অবাক করে দিয়েছেন। প্রার্থীর নাম আথার আমির শাফি খান। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ঘটনাটি কাশ্মীরের আড়াই দশকের অন্ধকার অতিক্রম করে সেখানকার মুসলমানদের একাংশের আলোয় ফেরাকে চিহ্নিত করে। আথার আমির শাফি খান ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় মেধাবী। তার স্নাতক স্তরের পড়াশোনা মান্ডির আইআইটিতে। আরও একটি চমকে দেবার মতো খবর হলো একই বছরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। একটি বি.টেক, অন্যটি আইএএস। বি.টেক পাশ করার পরেই একাধিক নামকরা বহুজাতিকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিভিল সার্ভিস ছাড়া অন্য কোনো চাকরির কথা ভাবতেও চাননি। কারণ তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান। বদলাতে চান মানুষের জীবন। থাকেন দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার একটি অজ গ্রামে। বিশ্বাস করেন এখন ভারতে যুবকদের জন্য একটা অন্যরকম সময় এসেছে। চারিদিকে অনেক সুযোগ। আথার আমির শাফি খান এই অন্যরকম সময়টিকেই কাজে লাগাতে চান। এগিয়ে যেতে চান সবাইকে নিয়ে।

ভারতীয় যুবসমাজের ব্যাপ্তি সমুদ্রসদৃশ। একটি ছোট নিবন্ধে তার সম্পূর্ণ রূপ তুলে ধরা কার্যত অসম্ভব। আমরা এখানে বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের একটা প্রয়াস করলাম। এই তালিকায় অনায়াসে জায়গা পেতে পারতেন দমদম পার্কের বাসিন্দা চিত্রপরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী। সম্প্রতি এই তরুণ 'দ্বিতীয় রিপু' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেছেন। এ ছবির সম্পাদকও অভিজিৎ। প্রযোজক তার বন্ধু গুঞ্জন বিশ্বাস। ছবির অন্যতম প্রধান অভিনেতা আর এক বন্ধু বিতান বিশ্বাস। ছবিটি ইতিমধ্যেই সাধারণ দর্শক এবং বিদ্বজ্জনদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। অভিজিৎ বলেন, 'এখনকার বাংলা ছবি হয় খুব বাণিজ্যিক নয় তো খুবই ইনটেলেকচুয়াল। আমরা আমাদের মতো দর্শকদের জন্য একটা ছবি বানাতে চেয়েছিলাম। তারই ফলশ্রুতি দ্বিতীয় রিপু।'

এরকম আরও অনেকে আছেন। যারা নিজেদের রাস্তা খুঁজছেন। অনুসরণ নয়, অনুকরণও নয়, ভারতের যুবক-যুবতীরা মৌলিক পথের সন্ধান চান। বস্তুত এটাই যৌবনের ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ এই যৌবনেরই আইকন। সৌভাগ্য, আজকের ভারত সেই ধর্মকে অগ্রাধিকার দিয়ে একের পর এক সম্ভাবনা তৈরি করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে দাঁড়িয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। যুবকযুবতীরা বুঝতে পারছেন তাঁরা একা নন। তাঁরা এক পা এগোলে কেউ একজন দু'পা এগিয়ে তাদের হাত ধরবেন। সেই কারণেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীপ্যমান যুবসমাজ আত্মপ্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। তারা স্বামীজীর মন্ত্রে জেগে উঠছে। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

যুব আইকন বিবেকানন্দ এবং আমাদের লজ্জাজনক ভূমিকা

অভিমন্যু গুহ

বেশ কয়েকবছর আগে আই আর আই এস নলেজ ফাউন্ডেশন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতের যুবসম্প্রদায়ের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছিল। তাদের গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল 'স্টেট অব দ্য আর্বান ইউথ, ইন্ডিয়া ২০১২ : এমপ্লয়মেন্ট, লাইভলিহুডস, স্কিলস্' শিরোনামে। রিপোর্টে বলা হয়েছিল একটি ভারতীয় শহরে গড়ে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন যুবক। সেন্সাস রিপোর্টের তথ্য বিশ্লেষণের ফলও ছিল একইরকম। তাতেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল ২০০১ সালে ভারতে পনেরো থেকে চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত যুবকদের সংখ্যা ছিল ৩৫.৩ কোটি। ২০১১ সালের জনগণনায় এই সংখ্যাটাই লাফিয়ে বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ৪৩ কোটিতে। সমীক্ষকরা বলছেন ২০২১ সালের মধ্যে এটা বেড়ে ৪৬.৪ কোটি ছুঁতে পারে। অবশ্য এরপর কিছুটা নিম্নমুখী গ্রাফের অনুমান করছেন তাঁরা। ২০২৬ সালের মধ্যে ভারতের যুব-সম্প্রদায়ের সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫.৮ কোটিতে।

এই তথ্যের সঙ্গে ২০১৪ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি রিপোর্ট অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ভারতে দশ থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ৩৫.৬ কোটি। সব মিলিয়ে হিসেবটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে দশ থেকে চব্বিশ এবং পনেরো থেকে চৌত্রিশ, এদের মধ্যে কিছু 'কমন' নিশ্চয়ই রয়েছেন কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে ভারতীয়ের সংখ্যা এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। অভিজ্ঞতার দাম নিশ্চয়ই রয়েছে। তার সঙ্গে

যৌবন ও তারুণ্যের উৎসাহও যে কোনো দেশের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইতিপূর্বে বাজেটে ভারতীয় যুবসমাজকে কখনও এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, যা দেওয়া হয়েছে ২০১৬-র বাজেটে। 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী অরুণ জেটলি। প্রধানমন্ত্রী কুশল বিকাশ যোজনায় সরকার বিভিন্ন 'স্কিল ইনস্টিটিউশন'গুলিতে সতেরোশো কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে। যাতে কারিগরী প্রশিক্ষণ পাবেন ছিয়াত্তর লক্ষ যুবক। এছাড়াও পনেরোশো 'মাল্টি স্কিল' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথাও ভেবেছে সরকার। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তাঁর বাজেট প্রস্তাবে এও আশা প্রকাশ করেছেন যে আগামী তিন বছরে অন্তত এক কোটি যুবক তাঁদের কারিগরী দক্ষতায় পারদর্শী হয়ে উঠবেন। এরই পাশাপাশি সরকার গুরুত্ব দিয়েছে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। সব মিলিয়ে ক্রীড়ার সঙ্গে যুব-কল্যাণকে মিলিয়ে যুবকদের কল্যাণের জন্য একটি মন্ত্রক স্থাপন করেই যেখানে ইতিপূর্বের কেন্দ্র ও অধিকাংশ রাজ্য সরকার তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, সেখানে বাজেটে এধরনের সংস্থান নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী।

১২ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক যুব দিবস হিসাবে ঘোষিত। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। যে স্বামীজী ছিলেন ভারতবর্ষের 'যুব আইকন'। সন্ন্যাস গ্রহণকে যাঁরা স্রেফ আধ্যাত্মিক কর্ম ভাবেন, স্বামীজী তাঁদেরকে একটু অন্যভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিলেন। অশিক্ষিতদের একটা ধারণা রয়েছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে সর্ব ধর্মসমন্বয়ের বাণী দিয়ে এসেছিলেন ইত্যাদি। আসলে ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় যে সর্বধর্মসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল তার এক এবং একমাত্র লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা। স্বামীজী কেবল এদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে এসেছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছিলেন। যে ধর্ম কেবল 'সব ধর্মকে সহ্যই করে না, সব ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে।' ১১ সেপ্টেম্বর এই ধর্মসভাতেই অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তিনি জগতের পবিত্রতম হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে গর্ববোধ করেন।

খ্রিস্টান মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল ভারতকে লুটেপুটে খাওয়া। বিবেকানন্দের সাফল্য একদিকে যেমন বিশ্বের দরবারে পরাধীন একটি দেশের নিচু মাথাকে উঁচুতে তুলে দিল তেমনি মিশনারিদের মুখোশটাও খুলে দিয়েছিল। আমেরিকায় কানাকানি হতে লাগলো যে আমরা এদের দেশে মিশনারি পাঠাই, এদেরই উচিত বরং আমাদের দেশে মিশনারি পাঠানো। এসব কথা খ্রিস্টানদের মোটেও সহ্য হচ্ছিল না। এই নরেন দত্ত ছেলেটা বরাবরই তাদের পাকা ধানে মই দিয়েছে। দেশে থাকতেও, এখন বিদেশে। ভারতে মিশনারিদের কাজ ছিল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে লিফলেট বিলি করা আর এদেশীয়দের ধরে ধরে খ্রিস্টান করা। এরকমই একদিন উত্তর কলকাতার হেঁদুয়ার

মোড়ে ক্রাইস্ট চার্চের সামনে খ্রিস্টান পাদরিরা লিফলেট বিলি করছিল। এমন সময় তারা পড়লো যুবক নরেন্দ্রনাথের সামনে। ওই লিফলেটে লেখা খ্রিস্টীয় তত্ত্বের রাশি রাশি ভুল বের করে নরেন প্রমাণ করে দিলেন মিশনারিদের কাজগুলো কতটা অন্যায়।

যুক্তি আর তর্কে তাঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা অশিক্ষিত- ধান্দাসর্বস্ব ও অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্ম ছিল না। নরেন্দ্রনাথ এদের সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন, 'তোমরা খ্রিস্টিয়ান নও, তোমরা চার্চিয়ান।' অর্থাৎ যীশুর ধার এরা ধারে না, এদের লক্ষ্য হিন্দু জাতিটাকে পুরো সেমেটিক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে মুনের সুখে এদেশে রাজত্ব করা।

'সেমেটিক'-এর ডিকশনারিগত অর্থ যাই হোক না কেন, বর্তমানে এটি গোঁড়া বা গোঁড়ামি অর্থে ব্যবহৃত করা হবে। ভারতবর্ষে একশ্রেণীর মানুষ ছিলেন, আছেন এবং কতদিন থাকবেন ভগবানই জানেন, যাদের কাছে সেমেটিক খ্রিস্টধর্ম, সেমেটিক ইসলামধর্মের মতো হিন্দুধর্মও সেমেটিক। অর্থাৎ 'হিন্দু' এদের কাছে খ্রিস্ট ও ইসলামের মতোই নিছক ধর্মমাত্র। এঁদের কানে এধরনের সাম্প্রদায়িকতার বা আরও স্পষ্ট করে বললে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুঁজ এতটাই বেশি যে সুপ্রিম কোর্টের রায় 'হিন্দুত্ব হলো জীবন পদ্ধতি', এটা এঁদের কানে জীবনেও ঢুকবে না। এই বোধ-বুদ্ধি থেকেই এঁরা বিবেকানন্দের চিকাগো অভিভাষণকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা ইত্যাদি বলে চালাতে চান। কানে সাম্প্রদায়িকতার পুঁজ না থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন বিবেকানন্দ তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুস্থানের গৌরবের আসনটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন এবং তাতে চূড়ান্ত সাফল্যও পেয়েছিলেন। এবং বিবেকানন্দ এই সফলতা খ্রিস্টান মিশনারিদের গায়ে কতটা জ্বালা ধরিয়েছিল তা তাঁর ওপর এদের নগ্ন আক্রমণে, চিকাগো বক্তৃতার আগে ও পরে, প্রমাণ হয়ে যায়।

বিবেকানন্দ যখন এই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি করেন তখন তিনি মাত্র ত্রিশ পেরনো এক যুবকমাত্র। ভারতবর্ষে তখন ধর্ম-কর্মের অর্থটি বেশ সংকীর্ণ। হিন্দুর ধর্ম আনুষ্ঠানিক উপাচার এবং মন্দিরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এক ত্রিশ বছরের যুবক সব এলোমেলো করে দিলেন। ধর্ম যে কেবল উপাচার-সর্বস্ব নয় তার সঙ্গে স্বাজাত্যবোধের যে চরম যোগাযোগ রয়েছে বিশ্বের সামনে তা তুলে ধরলেন বিবেকানন্দ। যারা বিশ্ববাসীর সামনে এমন একটা ধারণা তৈরি করতে চাইছিল যে ভারতবর্ষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ, এখানে সন্তানের জন্মের পর তাদের সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলা হয়— বিবেকানন্দ তাদের প্রচারের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি বললেন, ভারতে যা কিছু হয়েছে তা ধর্মের মধ্য দিয়ে হয়েছে। যা কিছু হচ্ছে এবং হবেও তা-ও ধর্মের মধ্য দিয়েই হবে।

ভারতবর্ষের ধর্ম ও ঈশ্বর-ভাবনাকে সংকীর্ণ করার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছিল বিবেকানন্দ তার প্রতিবাদে বললেন আগামী পঞ্চাশ বছর তোমার আরাধ্য হোক দেশমাতৃকা। ধর্মের জায়গায় দেশকে আর ঈশ্বরের জায়গায় দেশমাতৃকার কল্পনাকে যে গুরুত্ব তিনি দিয়েছিলেন তার ফলে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হলো অধ্যাত্মবাদে জারিত দেশপ্রেম। মনে রাখতে হবে আন্তর্জাতিকতাবাদ বা ইন্টার-.ন্যাশনালিজমের মধ্যেও 'ন্যাশনালিজম' শব্দটা রয়েছে। সুতরাং ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ ছাড়া আন্তর্জাতিকতাবাদও সম্ভব নয়। আজকের পরিস্থিতিটা অদ্ভুত। ভারতবর্ষে একদল মানুষ রয়েছে যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে জাতীয়তার ধারণাকে লঘু করার চেষ্টায় মরিয়া। এরাই আবার বাক্‌স্বাধীনতার নামে আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশ-বিরোধিতার ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্তও। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের সীমারেখা সংকীর্ণ ঠিকই কিন্তু সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ? আন্তর্জাতিকতাবাদীদের আদর্শে ন্যূনতম সত্যতা থাকলে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা তাঁরা করতে পারতেন না।

আসলে গলদটা আমাদেরই। বিবেকানন্দকে ঠাকুরঘরে আটকে রাখার এবং তাঁর ভাবাদর্শকে প্রচারিত না করতে পারার দোষটা আমাদেরই নিতে হবে। নইলে কোনো সভ্য দেশ তার মনীষীদের মূর্তিগুলি আক্রান্ত হতে দেখেও নিশ্চুপ থাকতে পারে? কোনো সভ্য দেশ তার একশ্রেণীর নাগরিক, যারা সেই দেশেরই খেয়ে-পরে তারি দাড়ি ওপড়ায়, সব দেখেশুনেও তাদের সহ্য করতে পারে?

এই দেশ ভারতীয়দের। হাতে পারে উপাসনা পদ্ধতি তাদের একেকরকম। কিন্তু ধর্মের দৃষ্টিতে সবাই তো সনাতনপন্থী, হিন্দু নামেই তার সার্থকতা। অথচ ইসলামিক দেশেও যা হয় না, সেই শরিয়তি আইন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বিবাদে চলতে পারে? এরপরে আর গণতন্ত্রের কিছু অবশিষ্ট থাকে?

বেশি দূর যেতে হবে না, বিবেকানন্দের জন্মস্থান এই পোড়া পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটাই দেখুন না। বিবেকানন্দ চরিত্র-গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। আর আজকের পশ্চিমবঙ্গে সিন্ডিকেট, তোলাবাজি আর মুসলমান তোষণে যুবকদের কোন চরিত্র গঠিত হচ্ছে ভগবানই তা জানেন। যে দেশে আরাবুলের মতো মানুষ কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হন এবং তার নির্দেশে সার্টিফিকেটওয়ালা শিক্ষক শিক্ষিকারা ওঠেন-বসেন ও এর অন্যথা করলেই যেখানে যমের বাড়ি যেতে হয়, সেখানে যুব-সমাজের চরিত্র গঠিত হবে না তো আর কোথায় হবে? যেখানে ধর্ষণ নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, যেখানে সাংসদ ধর্ষণের কথা বলে হাততালি পান, সেই দেশে যুব-আইকন চির-কৌমার্য ব্রতের অধিকারী বিরেকানন্দের জন্মদিবস পালিত হতে দেখলে লজ্জায় মুখ নত হয়ে আসে। মনে হয় ধরণী দ্বিধা হও। তবে ধরণী দ্বিধা হন আর নাই হন, পাতাল প্রবেশ আমাদের অনিবার্য। এত পাপ করেও পাতালে না ঢুকলে পাতালের ধারণাটাই তো লুপ্ত হয়ে যাবে। ■

ধুলাগড়িতে হিন্দুদের উপর আক্রমণ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে এই রাজ্যে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমহারে বেড়েছে হিন্দুদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার। তাদের মন্দির ভাঙা, জমি দখল, হিন্দুদের আক্রমণ এবং হত্যা ইত্যাদি। হিন্দু নেতারা এর প্রতিবাদ করলে তাদের উপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাবখানা এই, তোরা যা পারিস কর আমি মুসলমান তোষণ করে যাব। সে ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে অন্যবারের মতো সম্প্রতি হাওড়ার ধুলাগড়িতে। সেখানে মুসলমানেরা বিনা প্ররোচনায় হিন্দুদের আক্রমণ করে অনেক ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। বিজেপি নেতারা সেখানে তার প্রতিবাদ করতে গেলে আগেকার মতো তাদের ভাগ্যে জুটেছে লাঞ্ছনা। ঠিক এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০-৪০-এ ফজলুল হক এবং সুরাবর্দির প্রধানমন্ত্রিত্বকালে। কিন্তু তখন হিন্দু কাগজগুলি হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে খুব সোচ্চার ছিল। এখন হিন্দু কাগজগুলি এই সব ঘটনার নীরব দর্শক। এই অবস্থায় বিজেপি নেতাদের আশু কর্তব্য আর বিলম্ব না করে এই বিষয় সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তার জন্য প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি নেতা ও কর্মীদের নিয়ে মিছিল, দেশের এমপিদের একত্র করে সংসদের দুই কক্ষে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে নিয়মিত সোচ্চার হওয়া, রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে ধরনা দেওয়া এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং বিদেশে মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন শাখাগুলিতে কীভাবে বছরের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হবার পর থেকে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তার কালানুক্রমিক তালিকা উপস্থাপিত করা।

আর যেটি করতে হবে তা হলো কেন্দ্রীয় সরকারকে অবগত করানো, পশ্চিমবঙ্গে কী ধরনের মৌলবাদী অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ঘটছে এবং কোন কোন 'জাতীয়' পত্রিকা ভারতের ভিতরে ও বিদেশের দেশগুলির কাছে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। এটি করলেই এই সরকারের বিষ দাঁত ভাঙবে, হিন্দুবিদ্বেষী 'জাতীয়' পত্রিকাগুলিও নড়ে চড়ে বসবে। নইলে কখনও নয়।

—**কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী,**
কলকাতা-৩০।

আক্রমণকারী তৈমুর-এর নামে ভারতের সন্তানের নাম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ঠাকুর বংশের কন্যা শর্মিলা ঠাকুর (জন্ম : ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৬) ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি অভিনেত্রী। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অপুর সংসার'- এ অভিনয় করে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সিনেমা জগতের তারকাদের প্রচলিত অভ্যাসমতো তিনি নিজেই তাঁর পতি নির্বাচন করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো যে, তিনি তাঁর নিজের জাতি-ধর্ম ও সমাজের মধ্যে তাঁর জীবনসঙ্গী খুঁজে পাননি। একজন বিধর্মীকে পতিত্বে বরণ করে তিনি হলেন সে যুগের ভরতের বিখ্যাত ক্রিকেটার পতৌদির নবাব ওরফে ক্রিকেটার মনসুর আলি খান পাতৌদির স্ত্রী। তাঁরই ছেলে সইফ আলি খান।

চিঠিপত্র

হিন্দু অভিনেত্রী করিনা কাপুর অনুরূপভাবে এঁকেই পতিত্বে বরণ করলেন (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি? লাভ জেহাদ?)। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কিছুদিন আগে এঁদের যে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে তার নাম রাখা হলো তৈমুর (তৈমুর খান)। এই নিয়ে এখানকার সেকুমাকু কাগজগুলোর কতই না আদিখ্যেতা। কিন্তু ভারতের সন্তানের নাম রাখা হলো এক ভারত আক্রমণকারীর নামে!

—**প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,**
পাটুলি, কলকাতা-৯৪।

পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলের বিরোধিতা

নোট বাতিল ও নতুনোট বাজারে আসার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তি বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করেছেন। মাথার ঠিক রাখতে না পেরে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেছেন মোদীকে কয়েকদিন আগে ২৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। তবে সব থেকে বেশি চিৎকার করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জোট বেঁধে সংসদে যেতে চেয়ে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন।

এই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করাতে পশ্চিমবঙ্গের ম্যাডামের এত রাগ কেন? জনগণের সন্দেহ যে নির্বাচনে জেতার জন্য সারদা, নারদা থেকে আর এককোটি আশী লক্ষ টাকার ছবি বিক্রির টাকাগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে— তাই দিদির এতরাগ। কারণ তাঁর তহবিলে সুদীপ্ত সেনের সারদার টাকা, নারদার টাকা এত আছে যে সেটা না পারবেন খরচ করতে না পারবেন ব্যাঙ্কে জমা দিতে। সত্যি মোদীজী যদি একবার মমতা বহেনকে আগেই গোপনে বলে দিতেন তাহলে মোদীজী ভাল হতেন।

রাজ্যের সব ক্লাবগুলিও মোদীকে তুলোধুনো করেছে হাতের পাঁচ চলে গেল বলে। তিনি বিরোধীদের এককাট্টা করতে চাইছেন। কিন্তু মায়াবতী মুলায়ম জয়ললিতা তাঁরা এত বোকা নয় যে তাঁর মতে মত দিয়ে নিজেরা বোকা সাজবেন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলায় কয়েকটি আপ্তবাক্য আছে সেগুলি প্রয়োজনবোধে কিছু কিছু ব্যক্তির উদ্দেশে আরোপ করা যায়। যেমন

অলীক স্বপ্ন, আকাশকুসুম কল্পনা, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়া— এই সবকটি বিশেষণ উপযুক্ত আমাদের ম্যাডামের ক্ষেত্রে। কারণ এবার তাঁর যাবতীয় সাকরেদ-সহ তিনি দিবাস্বপ্ন দেখছেন ভারতকে মুসলমান দেশ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রী হওয়া। তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে গেছেন যেন সারদা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত সিবিআইকে না দেওয়া হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কালোটাকা উদ্ধারে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে করে ভীষণ উৎকণ্ঠায় আছেন পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক সমর্থন চলে যাওয়া মুখ্যমন্ত্রীর।

তাঁর সাকরেদ মুকুল রায়কে চিমটি কেটে বলতে হবে— 'স্যার আপনি কি ঘুমাচ্ছেন, কি বলছেন আপনি, উচ্চিংড়েকে আপনি পাখি বলছেন'। 'স্যার একটু ভেবেচিন্তে বলুন। কারণ হিন্দুতীর্থ হরিদ্বারের সঙ্গে মুকুলবাবু অন্য কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। স্তাবকতার একটা সীমা থাকা প্রয়োজন।

কালোটাকা ও বেনামি সম্পত্তি উদ্ধার করে ভারতকে স্বচ্ছভারতে পরিণত করতে যদি কারোর গায়ে লাগে তো লাগুক। সিবিআই এবার আর হাতে বা আঙুলে কালি নয়, কালোটাকা পেলে মুখে কালি মাখাবে সে মুখ্যমন্ত্রীই হোন আর যেই হোন।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

নীরব ঘাতক

স্বস্তিকায় ১২ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভারতীয় অর্থনীতিতে নীরব ঘাতক চীন' অম্লানকুসুম ঘোষের যুক্তিপূর্ণ রচনাটির বক্তব্যে আমি একমত। তবু দু' একটি কথা বলতে চাই। একথা সত্যি যে চীন ভারতের বড়মাপের বহুমুখী শত্রু। অন্তত আধ ডজন পথ ও পদ্ধতিতে ভারতের সর্বনাশ করতে সদা সক্রিয় রয়েছে। তাকে তার বাণিজ্যিক যুদ্ধে দমন করা সম্ভব।

(১) আমি মনে করি ভারতীয় ক্রেতারা নিজের ইচ্ছায় চীনা পণ্য বয়কট করতে সমর্থ হবে যদি একটি স্বদেশি আন্দোলন দেশব্যাপী রাষ্ট্র-হিতৈষী সংগঠনগুলির মাধ্যমে সফল করা যায়। ব্রিটিশযুগেও ক্রেতারা নিজের চেতনায় ব্রিটিশ পণ্য ছুঁড়ে ফেলতে পারেনি। স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে বলে-কয়ে বুঝিয়ে তা সফল করা হয়েছিল। তাতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ রাষ্ট্রদ্রোহীরা তখনো ছিল, আর এখন তো আরো অনেক বেশি মাত্রায় আছে। তারা রাস্তায় নামবে, টিভিতে টকশো করবে, কাগজের পাতায় জায়গা পাবে।

(২) স্বল্পায়ু হলেও সস্তায় প্রাপ্ত জিনিস ক্রেতারা কিনবেই। তবে চীন সস্তায় দিতে পারলে ভারতও পারবে। যে ভারতে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে সস্তায় চন্দ্রযান, মঙ্গলযান সফলভাবে তৈরি করতে পারে, সেই ভারতের বিজ্ঞানীরা চীনের সমান না হলেও চীনের কাছাকাছি দামে জিনিস তৈরি করতে পারবে নিশ্চয়ই। সেক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা করা দরকার, ট্যাক্সের সুবিধা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর বাকিটা স্বদেশি আন্দোলনের অনুভূতিতে চীনা জিনিস বয়কট করে স্বদেশি জিনিস কিনবে।

(৩) রাষ্ট্র-কল্যাণে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে বা ক্ষতি করলে, তার বা তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এদেশের খেয়ে এদেশেরই সর্বনাশ করার জন্য কমিউনিস্ট-সহ অনেক দল ও 'বুদ্ধিজীবী' রয়েছে। গণতন্ত্র মানে জাতীয় সর্বনাশতন্ত্র নয়।

(৪) ভারত সরকার বলে থাকে যে ডব্লিউটিও-চুক্তির কারণে ভারত চীনের পণ্য নিষিদ্ধ করতে পারে না। আমি মনে করি, জাতীয় সর্বনাশকে স্বীকার করে কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করা চলে না। এক্ষেত্রে ডব্লিউটিও-চুক্তির রাষ্ট্র-বিরোধী নীতি পরিবর্তন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা উচিত। ভারতের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশ যেমন সাহস করেই কিছু করছে, তখন ভারতেরও সাহস করে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় চাপ দিতে হবে।

—**টিমিড পেনস্পিকার,** বর্ধমান।

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ

জানকী তীর্থম্

আয়ুর্বেদিক ঔষধের দোকান

নেতাজী সুভাষপল্লী, গাজোল, মালদা

প্রো ঃ স্বপন চক্রবর্তী

কথা - ৯৫৯৩৮৮৬৬১২

ধূলিকণা

সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়া।

প্রোঃ- সীমা চক্রবর্তী

স্বপন চক্রবর্তী

সকল প্রকার রোগের অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক

সময়- সকাল ৯ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা।

মোঃ ৯৪৩৪৮১৯৭৬০

প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ ঔষধ বিক্রেতা। | নেতাজী সুভাষ পল্লী, গাজোল, মালদা।

কেদারনাথের ডোলিযাত্রায়

পরম্পরা

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

শোনা ছিল কেদারনাথ মন্দিরের শীতকালীন কপাট বন্ধ হয় কালীপূজার একদিন পর। সেই হিসেবে আমরা তিন বন্ধু (তাপস গাঙ্গুলী, নিরঞ্জন রায়) হাওড়া থেকে রওনা হলাম দুন এক্সপ্রেসে। ন' তারিখ সকালে হরিদ্বার স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে জানলাম সরাসরি শোনপ্রয়াগ যাবার বাস এইমাত্র ছেড়ে গেছে। সময় নষ্ট না করে সাড়ে সাতটায় গুপ্তকাশীর বাসে চেপে সন্ধ্যায় গুপ্তকাশী থেকে জিপে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে পৌঁছলাম শোনপ্রয়াগ। এখান থেকেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে কেদারনাথ যাবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। শোনপ্রয়াগের অবস্থান সাড়ে ছ' হাজার ফুট উচ্চতায় বাসুকি এবং মন্দাকিনী নদীর সঙ্গমস্থলে। রাতে খেতে গিয়ে হোটেল মালিকের মুখে শুনছিলাম ২০১৩-র ভয়ঙ্কর দুর্যোগে তাঁর প্রাণে বাঁচার অভিজ্ঞতার কথা। দুর্যোগের আগে নদী বয়ে যেত গভীর গিরিখাতে অনেক নীচ দিয়ে। দুর্যোগের পর নদী বুজে রাস্তা প্রায় আট ফুট ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধেয়ে আসা বালি পাথরের নীচে। মারা গিয়েছিল অনেক মানুষ। নদী এখন বইছে রাস্তার প্রায় সমান্তরালে। বক্তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সেই বিভীষিকা যেন আজও তিনি ভুলতে পারেননি। হাতে দু'দিন সময় পেয়ে যাওয়ায় ঠিক হলো পরদিন দর্শন করে আসব ত্রিযুগীনারায়ণ। হাঁটা পথে দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার।

পরদিন সকালে গেলাম বায়োমেট্রিক অনুমতি পত্রের জন্য। ২০১৩-র দুর্যোগে অগুন্তি প্রাণহানির পর চালু হয়েছে এই ব্যবস্থা। সেখানেও সহজেই পাশ হয়ে গেলে কিছু খাবার আর এক বোতল জল নিয়ে রওনা দিলাম ত্রিযুগীনারায়ণ। চেকপোস্টের আগে পথের বাম দিক দিয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে পথ। নিস্তরঙ্গ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে রাস্তা উঠে গেছে সুন্দর বনভূমির মধ্য দিয়ে। মনোরম পথটুকু পেরিয়ে দুই ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম ত্রিযুগীনারায়ণ। রাস্তায় উঠতেই একজন পাণ্ডা পিছু নিল পুজো করিয়ে দেবে বলে। পুরাণ কথায় আছে এখানে হিমালয় কন্যা পার্বতীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল শিবের। ভগবান বিষ্ণুর উপস্থিতিতে ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়েছিল সেই বিবাহ। যজ্ঞের সেই অখণ্ড ধুনিতে দাম্পত্য সুখের আশায় সমিধ প্রদান করে দম্পতিরা। মন্দিরের ভিতরে অষ্টধাতুর চতুর্ভুজ নারায়ণের মূল মূর্তির সঙ্গে আছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিব।

আকাশ মেঘলা ছিল সকাল থেকেই। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে আশ্রয় নিলাম মন্দিরের সামনে এক চালার নীচে। সেখানে বসে ছিলেন এক সাধু, কালিকামলি ধর্মশালার মোহান্ত। জানালেন প্রতি বছর যান সাগর মেলায়। এখন কাপড় পরে থাকলেও আসলে নাঙ্গা বাবা। বৃষ্টি থামলে জোর পায়ে ফেরার পথ ধরলাম। শোনপ্রয়াগ ফেরার পরও বিকেল পর্যন্ত কখনো জোরে, কখনো ধীরে বৃষ্টির খেয়ালে বেরতে পারলাম না কোথাও। বিকেলে গৌরীকুণ্ড যাবার গেট খুললে ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে গেটে আমাদের বায়োমেট্রিক কার্ড এন্ট্রি করিয়ে জিপে উঠলাম। আধ ঘণ্টা পর যেখানে নামলাম তাকে বিপর্যয়ের আগে দেখা গৌরীকুণ্ডের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। আগে যে নদী গভীর গিরিখাতের নীচে দৃষ্টির বাইরে থেকেও বহমানতার প্রবল গর্জনে জানান দিত, আজ সেই মন্দাকিনী নদী গৌরীকুণ্ডের অনেক হোটেল, আশ্রম, ধর্মশালা প্রায় সম্পূর্ণ গ্রাস করে সেই ধ্বংসস্তূপের পাশে শুয়ে যেন অলসভাবে জলকেলি করছে। নবনির্মিত সরু পথের ডানে বামে দশ পনেরো ফুট উঁচু পর্যন্ত ধসে পড়া ঘরগুলির ভিতরে বালি পাথরের স্তূপ দেখে কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায় ভয়াবহ মন্দাকিনীর সেই রোষ। অনেকটা উপরে উঠে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের বাংলোয় ঠাঁই নিলাম।

পরদিন সকালে পুলিশ চৌকিতে কার্ড এন্ট্রি করিয়ে যখন পথে নেমেছি অনেক দূর পর্যন্ত কোনো যাত্রী চোখে পড়েনি। প্রথম বিশ্রাম কুঠি পর্যন্ত চোখে পড়েছে ছ'জন রাস্তা সাফাই কর্মী। এ প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। রামওয়াড়া চটির অনেক আগে থেকেই দেখা যাচ্ছিল নদীর ওপারে নির্মীয়মাণ পথ। শুনেছি ওই পথ সম্পূর্ণ হলে ওপার দিয়ে লিনচোলি পর্যন্ত গাড়িতেই যাওয়া যাবে। পথের পাশে কিছুদূর পর পর তৈরি হয়েছে মল-মূত্র ত্যাগের জায়গা। রামওয়াড়া চটির একটু আগে মন্দাকিনীর নবনির্মিত সেতু পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে পথ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এখানে দেখা হলো এক সাধুর সঙ্গে। গেরুয়াধারী সাধুর হাতে গেরুয়া বস্ত্রে মোড়া দীর্ঘ দণ্ড ও

কমণ্ডলু। বয়স সত্তরোর্ধ্ব হলেও শরীরের বাঁধন শক্ত। জানা গেল তিনি কেদারনাথজী দর্শন করে আগামীকাল ফিরবেন। এতক্ষণে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার যাত্রীর দেখা পাওয়া গেল। দেখা যাচ্ছিল বারবার যাতায়াত করা যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। ওপারে পৌঁছে একটু উপরে উঠতেই নজরে পড়ে ওপারে পাহাড়ের গায়ে প্রায় এক কিলোমিটার বিস্তৃত ধস। আগে কেদারনাথে আসেননি এমন কেউ ধারণা করতে পারবেন না ওখানেই ছিল বহু মানুষের থাকার জায়গা-সহ অনেক দোকানপাট। সেই রামওয়াড়া চটি মন্দাকিনীর গ্রাসে সম্পূর্ণ বিলীন। কোথাও কোথাও সামান্য পথের চিহ্ন ছাড়া অবশিষ্ট নেই কিছুই। ধীর পায়ে চলতে চলতে দুপুরের আগে পৌঁছে গেলাম নতুন পথের এগারো কিলোমিটার দূরত্বের প্রথম রাত্রিবাসের স্থান লিনচোলি।

এখানে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম ও উত্তরকাশীর নেহরু পর্বতারোহণ সংস্থানের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত। এটাচড্ বাথ কটেজের ভাড়া মাথা পিছু তিনশো টাকা এবং তাঁবুতে মাথা পিছু একশো টাকা; টয়লেট একটু দূরে। লোকজন না থাকায় কার্ড এন্ট্রি করিয়ে আট শয্যার এক তাঁবুতে আমরা তিনজন হাত-পা ছড়ালাম। বিকেলে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট পরা কাঁধে গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে বছর চব্বিশের এক কন্নড় যুবক এলে আলাপ করে জানা গেল আই.টি নিয়ে বি.টেক করার পর বেরিয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে। অবাক হলাম তার সঙ্গে তেমন শীতবস্ত্র না থাকায়। সে আজই কেদারনাথ পৌঁছতে চায়। সন্ধ্যায় কেদারনাথের রুপোলী বরফ চূড়ায় লাল আবিরের খেলা দেখে তাঁবুতে ঢুকলাম।

পরদিন সকালে পাহাড় টপকে সূর্যের আলো আসার আগেই ধীর পায়ে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে নজরে পড়ল পথের পাশে জমা জল সব বরফ হয়ে আছে। গতকালের দেখা সেই প্রৌঢ় সাধুর সঙ্গে দেখা হলো। জানালেন উপরে খুব ঠাণ্ডা, তাই ভোর হতেই নেমে এসেছেন। অনেকটা উপরে উঠে খানিকটা নেমে দূর থেকে কেদারনাথের অবস্থান যেন একটু নীচে বলেই মনে হলো। অর্থাৎ নতুন পথ অনেকটা উপরে উঠে নেমে গেছে কেদারনাথে। আর সেই জন্যই পথ চলা কষ্টকর হয়েছে আগের থেকে। ওপারে আগেকার পরিত্যক্ত পথও দেখা যাচ্ছিল খানিকটা নীচে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রায় সমান্তরাল ভাবে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল পথের পাশের কিছু ঘর বাড়ি অক্ষত রয়েছে এখনো। চোখে পড়ছিল মানুষের যাতায়াতও। পথের ডান পাশে বিশ্রাম ছাউনি পার হয়ে একটা ছোট বরফ জমা জলাশয়ের মধ্যে জেগে থাকা পাথরের উপর ধ্যানস্থ এক পূজারির দেখা পেলাম। পাড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর চেলা জানালেন এই পূজারি কেদারনাথজীর বড় চেলা; তাঁকে দিয়ে পূজা করালে মনস্কামনা অবশ্য পূর্ণ হবে।

এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল বিপুল কর্মকাণ্ড। বামে জি.এম.ভি.এন. ও এন.আই.এম.উত্তরকাশী-র যৌথ উদ্যোগে সুদৃশ তাঁবুর অস্থায়ী বাসস্থান ও স্বল্প মূল্যে পরিচ্ছন্ন খাবার জায়গা। একটু এগিয়ে যেখানে মন্দিরের দু'পাশ থেকে নেমে আসা জলধারার মিলন হয়েছে। সেখানে তৈরি হচ্ছে হরিদ্বারের হর কি পৌড়ির মতো ঘাট। তারপরে পথের দু'পাশে আগেকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভগ্নপ্রায় পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির সারি। কপাট বন্ধের সমস্ত কার্যক্রম দেখব বলে মন্দিরের কাছে থাকার জায়গার খোঁজ করতে জানা গেল জায়গা নেই। ফিরে আসবার সময় এক পূজারি বললেন— 'একটা কামরা খালি আছে, দেখতে পারেন।' গিয়ে দেখলাম নীচের তলার ঘরটা একটু স্যাঁতসেতে। নীচের অর্ধাংশ ভাঙা দরজা অপটু হাতে মেরামতি হয়েছে প্লাইউড দিয়ে। বললেন— 'এর জন্য দিতে হবে ছ'শো টাকা এবং ঘর ছাড়তে হবে ভোর পাঁচটায়। কেননা, জলের লাইন, বিজলির লাইন বন্ধ করে, সমস্ত গুছিয়ে ঘরে তালা দিয়ে কেদারনাথজীর ডোলির সঙ্গে তিনিও নেমে যাবেন ছ'মাসের জন্য।'

ব্যাগ রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখি আমাদের উপরের ঘরেই আছেন কেদারনাথের প্রধান অর্চক শ্রী রাজাশেখরলিঙ্গ পূজারি। ইংরেজি, হিন্দি ও কন্নড়ভাষায় লেখা ফ্লেক্স দেখে অনুমান করা যায় পূজারি কর্ণাটকের মানুষ। মন্দিরের পাশে অফিস ঘরের ছাদে চলছিল রুপোর ডোলি সাজানোর কাজ। পূজারির এক সহকারীর তত্ত্বাবধানে পুষ্পহারে ডোলি সাজানোর পর শঙ্খধ্বনি করে সেই ডোলি নামিয়ে এনে রাখা হলো মন্দিরের ভিতরে। আসার সময় দেখেছিলাম মন্দিরের চাতালে ওঠার আগে ডানদিকে বাবার পাঁচ জন নাঙ্গা সন্ন্যাসী ধুনির আগুন ঘিরে বসে আছেন। অত ঠাণ্ডাতেও তাঁদের ভস্মাবৃত শরীরে সামান্য কাপড় মাত্র সম্বল। আর এক জন প্রৌঢ় ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী ডমরু বাজিয়ে খুব নাচছেন। শুনলাম নেহরু পর্বতারোহণ সংস্থান থেকে বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নিয়ে স্থানীয় যুবকেরা রাজ্য সরকারের হয়ে কাজ করছে এখানে। তারাই চালাচ্ছে যাত্রীনিবাস, ভোজনালয়। কর্ণাটকের এক সাধুর সঙ্গে আলাপ হলো। ভাঙা হিন্দিতে জানালেন দক্ষিণের ভোলেশ্বর মন্দির থেকে এসে গত ছ'মাস এখানে আছেন।

দুপুরের পর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর যুবকরা মন্দিরের সামনে গানের সঙ্গে নাচের আকারে কুচকাওয়াজ করল। সন্ধ্যায় উপস্থিত হলো কুমাউন রেজিমেন্টের ব্যান্ড পার্টি। এসেছিল স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, নিউজ চ্যানেলের সাংবাদিক, চিত্র সাংবাদিক, জেলা আধিকারিক পর্যন্ত। তিন পার্ষদ নিয়ে এক মাতাজীও এসেছেন যাত্রায়। সন্ধ্যায় বিশেষ পূজা, ভোগ নিবেদন, আরতির পর আবার নাচ-গান করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও কুমাউন রেজিমেন্টের ব্যান্ডপার্টি। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন সাধারণ যাত্রীরাও। মন্দির থেকে ঘোষণায় জানিয়ে দেওয়া হলো আগামীকাল মন্দির খুলবে রাত দু'টোয়। কেদারনাথের জলাভিষেক, শৃঙ্গার, বিশেষ পূজা, ভোগ নিবেদন, আরতি, সমাধির পর প্রতিমূর্তি নিয়ে রওনা হবে ডোলি। মন্দির বন্ধ হলে ঘরে ফেরার সময় দেখি একদিক খোলা একটা ঘরে আগুন ঘিরে বসে আছেন সেই ছ'জন নাঙ্গা সাধু।

পূজারির কথা মতো প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও ভোর পাঁচটায় ঘর ছাড়লাম। ব্যাগগুলো দরজার পাশে রেখে চলে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। শীতের কামড় থেকে বাঁচতে তিনটে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকে। আমরাও এসে দাঁড়ালাম একটা অগ্নিকুণ্ডের পাশে। যথাবিহিত নিয়মে চলছিল মন্দিরে পূজাপাঠ। ভোরের আলো ফোটার পরে শেষ হলো কেদারনাথজীর সমাধি। পিছনে

কেদারনাথ পাহাড়ের রুপালি শিখর ঘিরে জমে উঠেছে বাদল মেঘের ঘটা। তা দেখে একজন পূজারি বললেন— মনে হচ্ছে আজ থেকেই শুরু হবে তুষার বর্ষণ। একে শুভ লক্ষণ বলে মানা হয়। সেই দক্ষিণী সাধুকে দেখলাম এক গোছা বুনো ফুল নিয়ে অপেক্ষা করছেন কেদারনাথকে নিবেদনের জন্য। সাড়ে সাতটায় শুরু হলো ডোলি নিয়ে নিষ্ক্রমনের আয়োজন। কুমাউন রেজিমেন্টের ব্যান্ডের সঙ্গে প্রবল উদ্দীপনায় ডোলি তিনবার মন্দির প্রদক্ষিণ করে যাত্রা শুরুর সময়ে প্রধান পূজারি আভূমি প্রণিপাত করে অশ্রুসিক্ত হলেন। তারপর ঘোড়ার পিঠে চড়ে শুরু করলেন যাত্রা। পিছনে দুই বাহকের কাঁধে সুসজ্জিত ডোলিতে কেদারনাথজী। সবার আগে চলল কুমাউন রেজিমেন্টের বাদ্যকারেরা। মন্দাকিনীর সেতুর কাছে এসে প্রধান পূজারির বাহক ঘোড়াটি গা ঝাড়া দিতে শুরু করলে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে নেমে ঘোড়া ছেড়ে সবার সঙ্গে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করলেন। পিছনে চলল অগণিত যাত্রী। ডোলি এত জোরে চলতে লাগলেন যে অল্প সময়ে আমরা পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। বুঝতে পারলাম তাঁদের গতির সঙ্গে আমরা তাল মেলাতে পারব না।

আসার পথে নজরে পড়ছিল সকলের ফেরার তাড়া। শুনলাম পুলিশ এবং নির্মাণ কর্মীরা ছাড়া সকলকেই নেমে যেতে হবে। যাবার সময় যে দোকানে চা খেয়েছিলাম বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। দেখতে পেলাম না পথের সাফাই কর্মীদেরও। গৌরীকুণ্ডের কাছে এসে দু'জন ক্লান্ত সাধুকে দেখলাম ডোলি থেকে পিছিয়ে পড়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা ধীর পায়ে সাড়ে তিনটে নাগাদ গৌরীকুণ্ড নিগমের বাংলোয় পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেমে এলাম জিপ স্ট্যান্ডে। গাড়ি কম কিন্তু ফেরার লোক বেশি থাকায় বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর পুলিশের সহায়তায় গাড়ি পেলাম শোনপ্রয়াগ যাবার। শোনপ্রয়াগ এসেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর এল গুপ্তকাশী যাবার শেষ গাড়ি। অনেক কষ্ট করে নিজেদের গুঁজে দিলাম সেই গাড়িতে। স্থানীয় যাত্রীদের দেখলাম কষ্ট হলেও তেঁতুল পাতায় ন'জনের মতো সাদরে তুলে নিলেন আমাদের। এগারো আসনের সুমো গাড়িতে আঠেরো জনকে গাদিয়ে যখন গুপ্তকাশীতে নামাল তখন শরীর আড়ষ্ট, কষ্ট হচ্ছিল দাঁড়াতে। কাছেই একটা হোটেলে উঠে রাতে খেতে গিয়ে শুনলাম সন্ধ্যার আগে ডোলি পৌঁছে গেছে রামপুর। ওখানে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সহযাত্রীরা অনেকেই চলে এসেছেন এখানে। শুনলাম কাল ডোলি এখানেই থাকবে। সেই উপলক্ষে সারাদিন ধরে চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নিরঞ্জনদার পরামর্শে ঠিক হলো দিনটা গুপ্তকাশীতে না কাটিয়ে যাব দেওরিয়া তাল।

পরদিন সকাল ছ'টার বাসে চেপে নামলাম সারি যাবার রাস্তার মোড়ে। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তাপসদা সারিগামী এক মোটরসাইকেল আরোহীকে অনুরোধ করলেন সারি থেকে একটা গাড়ি পাঠাতে। কিছুক্ষণের মধ্যে লাখপত সিংয়ের পাঠানো গাড়িতে পৌঁছলাম সারি। এক কিলোমিটার মতো ওঠার পর একটা সুন্দর নিরালা মন্দির। তাপসদা পূজারির সঙ্গে আলাপ করে জানলেন তিনি একজন সেবা নিবৃত্ত জওয়ান। গ্রামে ফিরে ভগবানের সেবায় দিন কাটাচ্ছেন। অতিথিশালাও করবার ইচ্ছা ছিল, কিছু লোকের বাধায় করতে পারেননি। তাপসদাও বায়ুসেনার সেবানিবৃত্ত কর্মচারী শুনে বললেন— 'যখন খুশি চলে আসুন, আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকবেন।' পাহাড়ের ঢালে মন্দিরের নীচেই তাঁর বাসস্থান। একটু বিশ্রাম নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে আবার চড়াই ভাঙতে লাগলাম। ধীর পায়ে মিনিট চল্লিশ পরে রাস্তার উপর গোটা তিনেক অস্থায়ী দোকান দেখে বুঝলাম যাত্রা শেষ। এক দোকানি আমরা লাখপতের পাঠানো লোক কিনা জেনে নিয়ে বলল--- আপনারা বনবিভাগের পর্চি করিয়ে নিন, একটু পরে তাঁবু পাঠাচ্ছি।

ডান দিকের একটু ঢালু পথে নেমে বনবিভাগের অফিস থেকে পর্চি করাবার সময় জানতে পারলাম একজন নতুন মহিলা ফরেস্ট অফিসার দুজন রক্ষী নিয়ে গিয়েছেন জঙ্গল পরিদর্শনে। আলাপচারিতায় জানালেন তাঁর বাড়ি নীচে একটি গ্রামে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেলে ঘণ্টা দুয়েক লাগে। অনুমতি পত্র করিয়ে দেওরিয়া তাল সংলগ্ন মাঠে বসলাম। জায়গাটা এত সুন্দর এলেই মন যেন খুশিতে নেচে ওঠে। আমাদের আগে তিনটি স্থানীয় পরিবারের লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। পাশে একটা বড় বর্জ্য ফেলার পাত্র দেখে বোঝা যায় জায়গাটা পরিষ্কার রাখার জন্য নজরদারি আছে। তালের ওপারে নজরে পড়লো মিনার। তার বাম দিকে দূরে জঙ্গলের সীমারেখায় মাথা তুলেছে চৌখাম্বার রুপোলি চূড়ার সমাহার।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাতাস ঠাণ্ডা থাকায় রোদটা ছিল আরামদায়ক। চারপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে দুপুর গড়াল। সন্ধ্যা নামার আগে আরো কয়েকটা দল এলে মোট আটটা তাঁবু পড়ল। দিনের আলো নিভে যেতেই তাঁবুতে ঢুকলাম। দোকানদার এসে ডেকে গেল খাবার জন্য। সন্ধায় রাতের খাওয়া সেরে গল্পগাছা, গানে সময় কাটিয়ে আটটায় স্লিপিং ব্যাগে।

পরদিন তাড়াতাড়ি দেওরিয়া তালকে বিদায় জানিয়ে সকাল সাতটায় সারি থেকে জিপে পৌঁছলাম উখিমঠ। একটা দোকানে প্রাতঃরাশ সেরে স্যাকগুলো দোকানে রেখে মিনিট দশেকের ঢালু হাঁটা পথে গেলাম মন্দিরে, যেখানে আজ পৌঁছনোর কথা কেদারনাথজীর। পৌঁছে চোখে পড়ল সাজ সাজ। এখানকার প্রধান পুরোহিত কয়েকজন সেবক নিয়ে মন্দির সজ্জা শেষ করে মালা হাতে চললেন কেদাননাথজীকে স্বাগত জানাতে। আমরাও তাদের অনুগমন করলাম। যেতে যেতে দেখলাম রাস্তার পাশে, বাড়ির ছাদে উৎসুক নরনারী কেদারনাথজীর শোভাযাত্রা দর্শনের আশায় অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে। বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ অনেক নীচের রাস্তায় দেখা গেল ডোলির শোভাযাত্রা। পথে আসতে আসতে যাত্রায় যোগ দিয়েছেন অনেক মানুষ। বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করল কেদারনাথজীর ডোলি। সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাত্রায় এসেছি জেনে স্থানীয় দূরদর্শনের সাংবাদিকরা আমাদের ইন্টারভিউ নিলেন। এখানেই শেষ হলো কুমাউন রেজিমেন্টের ব্যান্ডপার্টি কাজ, যারা ডোলিযাত্রার সঙ্গে এসেছিল। আমরাও ফিরলাম উখিমঠের বাসস্ট্যান্ডে। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রুদ্রপ্রয়াগ-কনকচৌরি হয়ে কার্তিকস্বামী মন্দির। ■

মনীষী কথা

বিবেকানন্দের ছেলেবেলা

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। যদি প্রশ্ন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ কে? তাহলে একেকজন একেকরকমের উত্তর দেবে। কেউ বলবে স্বামী বিবেকানন্দ একজন বীর সন্ন্যাসী, কেউ বলবে তিনি যুবকদের আইকন। আবার কেউ কেউ বলবে বিবেকানন্দ এমন একজন মানুষ যিনি নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। এগুলো সবই ঠিক। কারণ, বিবেকানন্দের চিন্তা-ভাবনা ও কাজের ব্যাপ্তি ছিল বহুমুখী।

তবে সেসব যাই হোক না কেন, তার ছেলেবেলা ছিল আর পাঁচজন বালকের মতোই। অবাধ্য, ডানপিটে, দুষ্টু। রেগে গেলে তাণ্ডব করতে থাকে। মা ভুবনেশ্বরী দেবী সবসময় তটস্থ হয়ে থাকতেন এই বোধহয় কিছু করে ফেলল!

বিবেকানন্দের ছেলেবেলার নাম ছিল বিলে। ছোটবেলাতেই তার সাহস ছিল তারিফ করার মতো। একদিন এক ঘরে বন্ধুরা মিলে ধ্যান ধ্যান খেলা করছিল। সবার চোখ বন্ধ সেই সময় একটা সাপ ঘরে ঢুকলো। সাপ দেখে বন্ধুরা তো যে যেদিকে পারলো দে ছুট! কিন্তু বিলে নড়লো না, সে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেছিল।

একবার এক কাণ্ড ঘটালো। তাঁর বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন সেই সময়ের কলকাতার নাম করা উকিল। বাড়িতে নানা জাতের কত রকমের মক্কেলের আসা যাওয়া। কাছারি ঘরে সেই মক্কেলদের জন্য সাজানো থাকতো সারি সারি হুকো। সব জাতের মানুষের জন্য আলাদা আলাদা। কারোটা কেউ নেয় না। তাহলেই জাত যাবে।

বিশ্বনাথ দত্ত ঘরে ঢুকে খেয়াল করলেন ছোট্ট বিলে আপন মনে একের পর এক হুকো টেনে যাচ্ছে। আর নিজের দিকে বার বার দেখছে। বিশ্বনাথ দত্ত বললেন— তুই কী করছিস ওখানে? বিলে বলল— দেখছি কেমন কার জাত যায়।

দুষ্টু হলেও বিলে খুব মাতৃভক্ত ছিল। মায়ের সব কথা শুনতো। বাবা একবার জিজ্ঞেস করলেন— বিলে, তুই বড় হয়ে কী হবি?

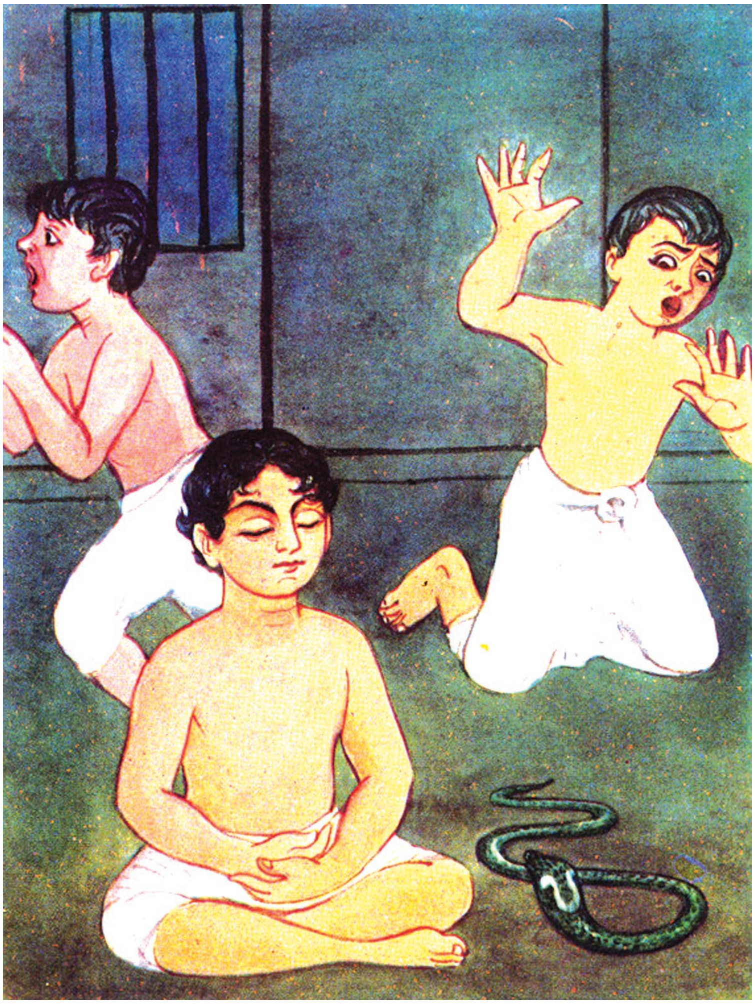

বিলের ঘোড়ার গাড়ি চড়ার খুব শখ। সে উত্তর দিল— আমি ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান হব। ছেলের কথা শুনে বিশ্বনাথ দত্ত খুব অবাক হয়ে গেলেন— উকিলের ছেলে কিনা কোচোয়ান হবে!

তখন মা ভুবনেশ্বরী দেবী বিলেকে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির সামনে এনে দাঁড় করালেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের ছবি। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। সেই ছবি ছেলেকে দেখিয়ে বললেন— তুই কি শ্রীকৃষ্ণের মতো কোচোয়ান হবি?

বিলে মাথা নেড়ে বলল— হ্যাঁ।

বিলে বড় হয়ে সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের মতো কোচোয়ান হয়েছে। সে হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষকে যিনি পথ দেখিয়েছেন। তাই দুষ্টুমি করলেও যারা মায়ের কথা শোনে তারা জীবনে অনেক বড় হয়।

ত্রিদিব সোম

ভারতের পথে পথে

জয়দেবের কেন্দুলি

বঙ্গ সংস্কৃতির এক ক্ষুদ্র সংস্করণ বীরভূম জেলায় জয়দেবের কেন্দুলি মেলা। অজয়ের তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম। গঙ্গাসাগরের মতো মকরসংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে পুণ্যস্নান করতে সমবেত হয় হাজার হাজার মানুষ। কদম্বখণ্ডিঘাটে নানা শ্রেণীর মানুষ ডুব দেয় পুণ্য সঞ্চয়ের আশায়। জমে ওঠে বাউলের আসর। শীতের রাতে আগুন জ্বেলে সারারাত ধরে চলে বাউলের সঙ্গে জাগরণ।

কবি জয়দেবের বিচরণভূমি এই স্থান। এখানেই তিনি রচনা করেছেন 'গীত-গোবিন্দ'। সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণে সুললিত কাব্য, যা সাধারণ মানুষের কাছেও সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে। জয়দেবের কেন্দুলী মেলা প্রতিবছর কবি জয়দেব কাব্য কীর্তিকে মনে করিয়ে দেয়।

এসো সংস্কৃত শিখি

यत्किमपि भवतु।

যা কিছুই হোক।

सः बहु समीचीनः।

তিনি খুব ভালো।

सः बहु रुक्षः।

তিনি খুব বদমেজাজি।

तद्विषये चिन्ता मास्तु।

ও বিষয়ে চিন্তা করবেন না।

तथैव इति न नियमः।

এমন কোনো নিয়ম নেই।

ভালো কথা

দেওয়ালেরও কান আছে

আমি একবার আগ্রা গিয়েছিলাম। সেখানে তাজমহল, দয়ালবাগ, সেকেন্দ্রাবাদ প্রভৃতি দর্শন করি। সেখানে 'দেওয়ালেরও কান আছে' প্রবাদ বাক্যটির সত্য রূপ দেখেছিলাম। সেকেন্দ্রাবাদে আমাদের লাইটকাকু একটি ৮/১০ মিটার লম্বা হলঘরে এনে আমাকে ও আমার বোন মৌমিতাকে কোনাকুনি দাঁড় করিয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে বললেন। আমরা কথা বলে পরস্পরের কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তখন আমার মনে হলো— 'দেওয়ালেরও কান আছে' কথাটি শুধু প্রবাদ নয়; খুবই সত্যি।

রূপষা দেবনাথ, ষষ্ঠ শ্রেণী।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ঘো ন্ধু ক ট

(২) সে জ স বা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) অ তা জি রা প

(২) র গ নী জ ন্ধা

২৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) করমণ্ডল (২) জলপ্রপাত

২৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) কাঙালিনি (২) শঙ্খচিল

উত্তরদাতার নাম

(১) সায়নী দে, পলাশী, নদীয়া, (২) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, উঃ ২৪ পরগনা (৩) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া, (৪) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অঙ্গনা

নিঃশব্দে চলছে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

শুভশ্রী দাস

পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা শহরে অথবা জেলা সদরে কিছু কিছু বাড়ির নেমপ্লেটে পরিবারের সদস্যদের নাম চোখে পড়ে। কিন্তু গ্রামে, প্রত্যন্ত গ্রামে বা বনবাসী সমাজের মাটির বাড়ি বা উলুখড়ের তৈরি বাড়িতে নেমপ্লেটে বাড়ির সদস্যদের নাম লেখা রয়েছে— এ কল্পনাতীত।

এই অসাধ্য সাধন করে চলেছে ছত্তিশগড় রাজ্য। প্রধানমন্ত্রীর ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে সেখানে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে বাড়িতে বাড়িতে নেমপ্লেট লাগানো। আর তাতে বাড়ির মেয়েদের নাম চোখে পড়ার মতো করে লেখা রয়েছে। সবুজের ওপর সাদা রংয়ে লেখা। ছত্তিশগড়ের বলোড জেলার জেলাশাসক রাজেশসিংহ রাণার উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে এমন ২৭০০ মেয়ের নাম তাদের বাড়ির নেমপ্লেটে বিশেষভাবে লেখা হয়েছে। জেলাশাসকের কথামতো সরপঞ্চরা তাঁকে এই কাজে সহায়তা করছেন। এতে নাকি মেয়েদের মনোবল বেড়েছে। ‘এই বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমিও আর সবার মতো এই বাড়ি আমারও’ —এই ভাবনা মেয়েদের মনে এসেছে। দোণ্ডীর স্কুল শিক্ষিকা নেহা দীক্ষিত জানালেন, ‘বাড়িতে সাধারণত বাড়ির মালিক অর্থাৎ পুরুষের নাম লেখা হতো। এখন সেখানে প্রাইমারি স্কুলে যাওয়া মেয়ের নামও লিখতে হচ্ছে, তাতে পুরুষদের অহঙ্কারে ধাক্কা লাগছে বই কী! কিন্তু সরকারি চাপের কারণে পুরুষরা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। জেলাশাসকের হিম্মত আছে। মেয়েদের সব কিছুতে অধিকার রয়েছে— এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তিনি লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন’।

ছত্তিশগড়ের সাফল্যের সংবাদে মহারাষ্ট্রেও বাড়ির মেয়েদের গুরুত্ব দেওয়ার অভিযান শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকারের গ্রামবিকাশ বিভাগ ২০০৩ সালে ‘ঘর দোনো কা’ অর্থাৎ ‘বাড়ি স্বামী স্ত্রী উভয়েরই’— অভিযান শুরু করে। কিন্তু তা কাগজে কলমেই রয়ে যায়। দায়িত্ব গ্রামসেবকদের দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু তা আইন ছিল না, সরকারি সিদ্ধান্তমাত্র ছিল, তাই কেউ গা করেনি। পারিবারিক হিংসায় মহিলারা ন্যায়বিচার প্রায় পেতেন না। বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তাদের মাথা গোঁজার জায়গা ছিল না। সঙ্গে শিশু সন্তান থাকলে মায়ের অবস্থা আরও করুণ হোত। এই অবস্থায় সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় লক্ষ লক্ষ মহিলা জীবনের নিরাপত্তা পেয়েছে। সরকারের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও এই কাজে এগিয়ে এসেছে। এখন বাড়ি ও জমির দলিলে স্ত্রী ও মেয়েদের নামও থাকছে। পুনা জেলার পুরন্দর তহসিলে ন’ হাজার পরিবারে বাড়ি ও সম্পত্তির দলিল স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে করা হয়েছে। এর ফলে ‘বাড়ি আমারও’ এই অধিকার মহিলাদের মিলেছে। অকোলা তহসিলে ‘অমৃত মেহতা প্রতিষ্ঠান’ নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরকারি বিভাগের সহায়তায় এই কাজ করছে। তারা বাড়ি ও জমিজমার দলিলে যাতে পত্নীর নামও থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ভাণ্ডারদরার কাছে রতনওয়াড়ি নামে বনবাসী মহল্লা। বাড়ি বলতে উলুখড়ের কুটি। ১০০ পরিবারের বাস। প্রতিটি বাড়িতেই নেমপ্লেট। তাতে স্বামী, স্ত্রী দু’জনের নাম লেখা রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পঞ্চায়েত অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অসাধ্য সাধন করেছে। বনবাসী এলাকা হওয়ার জন্য পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও অহঙ্কার কম থাকে। এজন্য সহজে এ কাজ করা গেছে। মিশ্র এলাকায় কাজ করা কঠিন। পুরুষদের বিরোধিতা থাকে। কিন্তু গত দেড় বছরে এই তহসিলে রাজ্য সরকারের সহায়তায় ৬৮ হাজার বাড়ির মধ্যে ৬২ হাজার বাড়ি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে দাখিল হয়েছে। সাঁতরা, কোরেগাঁও, খটাও এলাকার ২০টি গ্রামে ১০০ শতাংশ কাজ হয়েছে। ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে নিঃশব্দে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে চলেছে। এর পিছনে কোনো নারীবাদী আন্দোলন নেই। শুধু আছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা। সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে সত্যিকারের সমাজসেবী সংস্থাগুলি। তাই আজ ওই রাজ্যগুলিতে নিঃশব্দে হয়ে চলেছে নারীর ক্ষমতায়ণ। সঙ্গে চলছে নারীর সম্মানজনক অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাই আজ সেখানে বাড়ির নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে মেয়েদের নাম। ■

প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপের সুদূরপ্রসারী অভিঘাত

বিমুদ্রাকরণের হাতিয়ার নিয়ে সরকার কালোটাকার সঙ্গে দ্বৈরথে লিপ্ত

অতিথি কলম

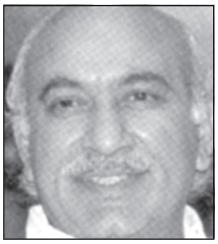

এম জে আকবর

সদ্যসমাপ্ত ২০১৬ সালের সবচেয়ে গগনচুম্বী পরিবর্তন-প্রত্যাশী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনের যৌক্তিকতা খোঁজা আদৌ শক্ত নয়। একটি সহজ সমীকরণ হলো, নগদ লেনদেন কখনই দুর্নীতিজনিত নয়। কিন্তু প্রত্যেকটি দুর্নীতি সম্পৃক্ত লেনদেনই নগদ টাকায় করা হয়। আর এই সূত্রে উচ্চ রাশির প্রচলিত মুদ্রাঙ্কগুলিই এই কালো লেনদেনের মাধ্যম। সত্যিই যদি কেউ দুর্নীতির মূল ও প্রলম্বিত শাখা প্রশাখাগুলিকে উপড়ে ফেলতে চায় তাহলে কিন্তু একশ্রেণীর মানুষকে খুশি রাখতে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু ডালপালা ছেঁটে হাত গুটিয়ে নিলে কিছুই হবে না। আপনাকে কিন্তু অভিশাপের গোড়ায় কুঠারাঘাত করতে হবে। দুর্নীতি হচ্ছে সেই বিকৃত কৌশল যার মাধ্যমে সমাজের অভিজাত শ্রেণী আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দু'টি পরিসরের বিশ্বাসযোগ্যতাই যুগপৎ বিষাক্ত করে দিয়েছে।

অধিকাংশ সময়ই সরকার হয় এদের সঙ্গে গোপনে দোসর হয়েছে নয়তো অসহায় দর্শক হয়ে থেকেছে। ফলে এদের বদ্ধমূল ধারণা শুধু নয় এক বিপুল ঔদ্ধত্যও মজ্জাগত হয় যে, কব্জায় থাকা কালোটাকার দাপটে তারা আইনের ঊর্ধ্বে। সরকারের কোনো রকমের কড়া সিদ্ধান্তই তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এই নিশ্চিন্ততার আবহটিই হঠাৎ তছনছ হয়ে গেছে। এর সঙ্গে দেওয়ালের লিখনও তাঁরা পড়তে পারছেন। যারা এতকাল দুর্নীতির ক্ষমতা ও প্রয়োগের অভ্রান্ততার ওপর পিএইচডি করে বসেছিলেন তাঁদের কপালে মোদী ঘোর বিপদের সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছেন। এঁরা যে কিছুরই পরোয়া করেন না, সরকারের দেওয়া যে-কোনো সুযোগ হেলায় অবহেলা করতে পারেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছিল যখন শেষ হওয়া বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি কেবলমাত্র ৩০ শতাংশ কর দিয়েই অঘোষিত আয়কে আইনি করে দেওয়ার সহজ সুযোগ সরকার দিয়েছিল। সে সময় এই ট্রেনটি ধরলে এক শান্ত, চিন্তাহীন জীবন যাপনের অবকাশ তাঁরা পেতেন, পরিবর্তে এখন মোকাবিলা করছেন এক অর্থনৈতিক আতঙ্কের। এর কারণ হচ্ছে সরকারের আগ বাড়িয়ে দেওয়া সুযোগটিকে তাঁরা বরাবরের মতো মনে করেছিলেন এটিও চিরাচরিত সাময়িক চমক। এতে সাড়া না দিলেও কিছু হবে না। তাঁরা ছিলেন বেপরোয়া। তাঁদের এই অনন্ত নিশ্চিন্ততারও কারণ আছে। তাঁরা তো অতীত ইতিহাস জানতেন। আরও জানতেন এ বিষয়ে সরকারের নিজের অভ্যন্তরেই দ্বিধা ও দোটানা রয়েছে। সরকার মনে করত দুর্নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে হলে যে প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে তাকে অভিষ্টে পৌঁছতে হবে তাদের নীতিনিষ্ঠায় তো ঘুষ খেয়ে খেয়ে ঘুণ ধরে গেছে। এ বিষয়ে এক চিন্তাশীল প্রাচীন বন্ধু বলছিলেন, কখনই ৭০ বছরের ক্রমিক বেঠিক পথে চলা এক দিনেই সঠিক হয়ে যেতে পারে না। আর এক্ষেত্রে যে বিরাট কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে তার ক্ষমতার বিশালত্বকে আদৌ খাটো করে দেখা চলে না। তারা বিমুদ্রাকরণের ফলশ্রুতিতে মানুষের সাময়িক কষ্টকে যে-কোনো মূল্যে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিরাট করে দেখিয়ে একটা ঘনায়মান বিপদের কৃত্রিম পরিমণ্ডল তৈরি করার ক্ষমতা ধরে। পেটোয়া মোসাহেবদের কাজে লাগিয়ে জনতার মতামতকে প্রভাবিত করতেও তারা পারদর্শী। এতো আমরা চাক্ষুষ করছি। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা একটা জিনিস হিসেবের মধ্যে রাখতে পারেনি। সেখানেই হয়েছে গোলমাল।

দেশের ৯০ শতাংশ মানুষই কিন্তু স্বভাবগতভাবে সৎ। আর এই ৯০ শতাংশই এতকাল কায়মনোবাক্যে চাইছিল এই সর্বশক্তিমান কালো দৈত্যের ওপর দীর্ঘস্থায়ী ও মারণ আঘাত করার মতো কেউ কি আদৌ আসবে না! একবার কিছু চমক দিয়ে চলে গেলেই হবে না, দীর্ঘকালীনভাবে দুর্নীতির

অধিকাংশ সময়ই সরকার হয় দুর্নীতিগ্রস্তদের সঙ্গে গোপনে দোসর হয়েছে নয়তো অসহায় দর্শক হয়ে থেকেছে। ফলে এদের বদ্ধমূল ধারণা শুধু নয় এক বিপুল ঔদ্ধত্যও মজ্জাগত হয় যে, কব্জায় থাকা কালোটাকার দাপটে তারা আইনের ঊর্ধ্বে। সরকারের কোনো রকমের কড়া সিদ্ধান্তই তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। এই নিশ্চিন্ততার আবহটিই হঠাৎ তছনছ হয়ে গেছে।

দানব দমনের দায়বদ্ধতা ও হিম্মতও তার থাকা চাই। কালোটাকার বাজনদাররা আন্দাজ করতে পারেননি এই ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠী নোট বাতিল-প্রক্রিয়াজনিত কষ্টকে দেশে সততা, ন্যায় পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তাদের তরফে দেওয়া এক সমষ্টিগত মূল্য প্রদান বলেই মেনে নিয়েছিল। দুর্নীতির ক্যানসারের প্রতিষেধক ব্যয় ছিল এই গণ-ক্লেশ। এ কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি তার প্রমাণ এমন একটা সর্বব্যাপী পরিবর্তন প্রক্রিয়ার রূপায়ণে কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য হিংসার প্রকাশ দেখা যায়নি। এমন ঘটনা অকল্পনীয় নিশ্চয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যখন আরও কিছুদিন পরে নোটবন্দি সংক্রান্ত মিশ্রিত সংবাদ প্রচারের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা থিতিয়ে নিয়ন্ত্রিত ও সঠিক ইতিহাস পরিবেশিত হবে তখন কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণিত হবে আমাদের দেশের এই বহুনিন্দিত সিস্টেমই কিন্তু এমন হিমালয় প্রমাণ কর্মকাণ্ডকে সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিল। সন্দেহ নেই এতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল আর এত বড় ব্যাঙ্কের পরিপাকযন্ত্রের পক্ষেও সাময়িক হেঁচকি-টেঁচকি অবশ্যই উঠেছে। কিন্তু হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার নতুন মুদ্রা ছাপানো থেকে শুরু করে দেশের সুদূর প্রান্তে তার নির্ধারিত বিতরণও বাস্তবায়িত করেছে। ব্যাঙ্ক, পুলিশ, করব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মী, ই ডি, সিবিআই প্রভৃতি সংস্থায় কর্মরত অনামি অসংখ্য মানুষ তাদের নির্ধারিত কর্ম ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনরাত এক করে দেশের সমাজজীবন, রাজনীতিক্ষেত্রে ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রক্তসঞ্চালন পুনরুদ্ধার করেছেন।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এই কর্মযজ্ঞ রূপায়ণ পর্বে অনেক ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণরা মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বেআইনি বেহিসেবি টাকা পাতাল থেকে জমিতে উঠে জায়গা করে নিতে দুর্নীতি, পরিস্থিতির অপব্যবহার, অপকৌশল প্রয়োগ করে মোটা কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে বহু মানুষকে কুপথে নামিয়েছে। এদের অনেকেরই ইতিমধ্যে জেলে জায়গা হয়েছে। তবুও যতই নোংরা পথে রঙ-বদলির খেলা হোক না কেন শেষমেশ তো কালোটাকা ব্যাঙ্কের আওতাতেই ঢুকছে। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্ন গল্পেরও একটি নীতিকথা রয়েছে, সেটি হলো এই অপকর্মের খলনায়কদের শুধু ধাওয়া করে ধরা নয় তারপরও কোনো আপসে মিটিয়ে ফেলার পরিচিত খেলা হয়নি। অপরাধী শাসকদলের লোক হলো কিনা এটা কখনই বিচার্য ছিল না। সেটি কখনই পলায়ন-পথ হতে পারেনি। পাকড়াও হওয়ার পর কোনো ফোন কল করা যায়নি।

এই সূত্রে একজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩২ কোটি টাকা উদ্ধারের সূত্র ধরে রাজনীতি, কারবারি প্রশাসন যন্ত্রের যে পরিচিত মুখ শোঁকাশুঁকি প্রচলিত ছিল তা একেবারে বেপর্দা হয়ে যায়। ওই ব্যবসায়ীর দেওয়া ক্লু ধরে একটি রাজ্যের প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা অর্থাৎ প্রধান সচিবের বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়। ওই কর্তা ক্ষেপে গিয়ে অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতার নাম করে পক্ষান্তরে বাঁচার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। ভারতীয় রাজনীতির এ এক যুগান্তকারী পরিবর্তন চিহ্ন। এই তল্লাশির পর দুর্নীতির এক জ্বালামুখ খুলে যায়। বিমানবন্দর থেকে পালানোর সময় ধরা পড়েন কলকাতার কুখ্যাত মানি Launderer (টাকা কালো সাদা করার দালাল) পরসমল লোধা। তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে যান এক প্রতিষ্ঠিত ঠগবাজ সি.এ যিনি বহু কোটি কালোটাকা সাদা করায় লিপ্ত ছিলেন। লোধার লকারে বাজেয়াপ্ত হয় ২৫ কোটি। যাইহোক, এই সব গল্প হবে অন্তহীন। গত সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই সবে শুরু। আপনার যদি এসব বিষয়ে জানার সেরকম আগ্রহ থাকে তাহলে বেশি কিছু করতে হবে না, শুধুমাত্র ভাল করে আপনার পছন্দের খবরের কাগজের ভেতরের পাতাগুলো মন দিয়ে পড়ুন। কোনো কাগজই আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ কভারেজ দিতে পারবে না। কেননা অপর্যাপ্ত নিউজ প্রিন্ট তো নেই। লিখে যে শেষ করা যাবে না রোমহর্ষক সব কাহিনি! এরই মধ্যে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ২৪ ডিসেম্বর ১৭ পাতাটা একটু নজর দিলে দেখবেন— (১) বেঙ্গালুরুতে ধরা পড়ল ৪৮ কোটি টাকা, (২) ৩.৮৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হলো কলকাতায়, (৩) পঞ্জাবে আটক হয়েছে ২৬ লক্ষ, (৪) একটি চার্টার্ড বিমানকে মাঝপথ থেকে নামিয়ে আনা হলো তার মধ্যে পাচার হচ্ছিল বাজেয়াপ্ত ৩.৫ কোটি টাকার নোট। আবার অন্যদিকে একটি খবরে চোখ রাখুন, ৫০০ টাকার নোট মুদ্রণে তিন গুণ বৃদ্ধি। মধ্য নভেম্বরে ৩.৫ মিলিয়ন থেকে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ১০ মিলিয়ন নোট ছেপে বেরোচ্ছে। বেঙ্কাইয়া নাইডু বললেন ব্যাঙ্ক সুদের হার কমাতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি বেঙ্কাইয়া আগামীদিনের খবর অগ্রিম দিয়ে যাচ্ছেন। এই ৫০ দিনের সরকারি কার্যকলাপে এটা পরিষ্কার যে সরকার বিপুল পুনরুজ্জীবিত অর্থ গরিবের উন্নয়নের ও ক্ষমতায়নের পথে নিশ্চিত ভাবে নিয়োজিত করবে। সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে শুরু হয়েছে ডিজিটাল বিপ্লব। এক প্রশিক্ষকের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ মানুষজনকে আসন্ন কম নগদের অর্থনৈতিক লেনদেন করার ক্ষেত্রে নতুন মাধ্যমগুলির সহজ ব্যবহার সম্পর্কে সড়গড় করে তুলতে ব্যস্ত। একই সঙ্গে ডিজিটাল যন্ত্র নির্মাতা ও সংযোগকারীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বৈদ্যুতিন নিরাপত্তা আরও আঁটোসাটো করতে যাতে নতুন দুর্নীতির জন্ম আটকানো যায়। এত বিচিত্র সংবাদ সমাগমের পরও বলতে হবে এই নোট বাতিল প্রক্রিয়ার সব থেকে চমকপ্রদ ও শক্তিশালী ছবিটি প্রকাশিত হয়েছে পূর্বোল্লেখিত ওই ১৭নং পাতাতেই। লক্ষ্ণৌ-য়ের এক কাগজ কুড়ানোওলার মুখে দেখা যাচ্ছে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের এক অভিব্যক্তি। তার দু'টি করতল পরস্পর আবদ্ধ দেখে মনে হয় হয়তো এখুনি হাততালি দিয়ে উঠবে। ছবিতে যে দাঁড়িয়ে আছে বাতিল ১০০০ টাকার নোট বিছানো বেশ দীর্ঘ একটি জমির সামনে। এই মসীবর্ণের অর্থভাণ্ডার সে পেয়েছে গত ২৩ নভেম্বর লক্ষ্ণৌ-য়ের বাদশানগরের একটি নর্দমা সাফ করতে গিয়ে। বেচারা নোটগুলিকে শুকনো হতে দিয়েছে। কী আশ্চর্য প্রতীকময়তা! বাদশানগরের নালাগুলি বুজে আছে অতীত আবর্জনায় (টাকা বদলের হিম্মত নিশ্চয় কোনো রইসের হয়নি)। আমি আশা করব ওই সাফাইকর্মী যেন অবশ্যই ওই নোটগুলি শুকনো হয়ে যাওয়ার পর নিকটবর্তী কোনো ব্যাঙ্কে গিয়ে সেগুলি বদল করে 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার' আনন্দ উপভোগ করে। এটা তো তারই হকের টাকা মানতেই হবে। এ অর্থ কালোটাকার রাজপুত্ররা তার কাছ থেকেই তো অতীতে চুরি করেছিল তাই না! ∎

জনজীবনের নিরাপত্তার জন্যই সড়কের পাশে মদের দোকান নিষিদ্ধ

ধর্মানন্দ দেব

বলতে লজ্জা নেই পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক রাস্তা ভারতে। কেননা জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডের রিপোর্ট মতে ভারতে প্রতি ১ ঘণ্টায় প্রায় ১৭ জনের মৃত্যু হয় পথ দুর্ঘটনায় এবং প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৫৭টি দুর্ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ প্রতিদিন ভারতে ৪০০ জনেরও বেশি লোক পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান। জানা যায় ২০১৫ সালে ১ লক্ষ ৪৬ হাজারের মানুষ রাস্তায় দুর্ঘটনায় মারা যান। শুধু মৃত্যু নয় একই সঙ্গে বাড়ছে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং দুর্ঘটনায় আহতের সংখ্যা। ২০১৩ সালে আহতের সংখ্যা ছিল ৪.৫ লক্ষ এবং ২০১৪ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৮ লক্ষ এবং ২০১৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৫ লক্ষেরও বেশি হয়ে যায়। ট্রাফিক দুর্ঘটনাকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়, সেগুলি হচ্ছে— (১) মোটর দুর্ঘটনা, (২) রেল দুর্ঘটনা এবং (৩) রেল ক্রসিং দুর্ঘটনা। উল্লেখ্য, ভারত মোটর দুর্ঘটনার চেয়ে রেল দুর্ঘটনা কম। ভারতে ১ লক্ষ ১৫ হাজার কিলোমিটারের উপর রেলপথে প্রতিদিন ১০ হাজার যাত্রীবাহী ট্রেন সহ প্রায় ২০ হাজার ট্রেন চলাচল করে। ২০১৪ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে দেশে ট্রেন দুর্ঘটনা ও ট্রেন সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় ২৭ হাজার ৫০০ মানুষ মারা যান। প্রতিদিন দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহর মুম্বইতে রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় দশজনের। ২০১৫ সালে ৩ হাজার ৩০০ জন সেখানে মারা গেছেন রেল দুর্ঘটনায়।

এই মাত্রাতিরিক্ত পথদুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে বেপরোয়া ও তীব্রবেগে গাড়ি চালানো। পরিসংখ্যান বলছে, মোটর দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া মানুষের মধ্যে অর্ধেকের মৃত্যু হয় মোটরবাইক, ট্রাক বা লরির সংঘর্ষে। আর এইসব মোটর দুর্ঘটনার পিছনে চালকের মদ্যপান অনেকাংশে দায়ী। বিশেষ করে দুরপাল্লার গাড়িচালকরা অনেকেই মদের দোকান থেকে মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাড়ি চালান। সেজন্য চণ্ডীগড়ের 'অ্যারাইভ সেফ সোসাইটি' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রথমে পঞ্জাব-হরিয়ানা এবং রাজস্থান হাইকোর্টে পৃথক পৃথক জানস্বার্থ সম্পর্কিত মামলা করে। ওইসব মামলার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য ও জাতীয় সড়কের পাশ থেকে মদের বিজ্ঞাপন ও মদ সংক্রান্ত ব্যানারও সরিয়ে ফেলা। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ২০১৪ সালের ১৮ মার্চ এক নির্দেশ জারি করে মদের বিজ্ঞাপন ও মদ সংক্রান্ত ব্যানার জাতীয় সড়কের পাশ থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ দেয় এবং ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ রাজস্থান হাইকোর্ট জাতীয় সড়কের ১৫০ মিটারের মধ্যে থাকা মদের দোকান উঠিয়ে নেওয়ার এক নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে রাজ্য সড়কের পাশে মদের দোকান খোলার আবেদন জানায়। সুপ্রিমকোর্ট প্রথমে অন্তর্বর্তী নির্দেশ প্রদান করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে রাজ্য ও জাতীয় সড়কে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা বলে। অতি সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্টের প্রধানবিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এক চূড়ান্ত রায় প্রদান করে জানায়, জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ধারে মদের দোকান নিষিদ্ধ। ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে। বর্তমানে জাতীয় সড়কের পাশে যে সব মদের দোকান রয়েছে ২০১৭ সালের ৩১ মার্চের পর তাদের লাইসেন্স আর পুনর্নবীকরণ করা হবে না। এমনকী, রাজ্য ও জাতীয় সড়কের পাশ থেকে মদের বিজ্ঞাপন ও মদ সংক্রান্ত ব্যানারও সরিয়ে ফেলতে হবে। নির্দেশে আরো বলা হয়েছে, রাজ্য ও জাতীয় সড়ক থেকে ৫০০ মিটারের বেশি দূরে মদের দোকান খোলা রাখার অনুমতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য দিতে পারবে। ওই মামলায় ২১ পৃষ্ঠার ২৫ প্যারাগ্রাফের চূড়ান্ত রায় প্রদান করে সুপ্রিমকোর্ট ২৪ নম্বর প্যারাগ্রাফে সংবিধানের ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক

ছয়টি নির্দেশ প্রদান করে :

(১) সমগ্র দেশের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলি এখন থেকে জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের পাশে মদ বিক্রির কোনো লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে না। (২) এই জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পৌরসভা, শহর, নগরের ভিতরে প্রবেশ করেছে সেখানের সড়কের পাশে মদ বিক্রির কোনো লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না। (৩) এই নির্দেশের পূর্বেই যে লাইসেন্সগুলি নবীকরণ হয়ে গেছে সেগুলি মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আর লাইসেন্স নবীকরণ করা যাবে না। অবশ্য সেই মেয়াদ কোনো অবস্থায়ই ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল হবে না। (৪) মদ বিক্রির কোনো বিজ্ঞাপন বা কোনো সংকেত জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের পাশে থাকতে পারবে না। (৫) কোনো মদের দোকন হবে না : (ক) জাতীয় ও রাজ্য সড়ক থেকে দেখা যাওয়া অবস্থানে, (খ) জাতীয় বা রাজ্য সড়ক থেকে সহজে পাওয়া যাওয়া অবস্থায়, (গ) জাতীয় বা রাজ্য সড়ক বা সড়কের সার্ভিস লেনের ৫০০ মিটারের পাশে, (৬) এক মাসের মধ্যে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মুখ্য সচিব ও পুলিশের ডিজিপি রাজ্যের রাজস্ব ও গৃহমন্ত্রকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে নির্দেশ সমগ্র দেশের নিজ নিজ রাজ্যগুলিতে কার্যকর করে তুলতে হবে। এই দায়িত্ব দিতে হবে প্রতিটি জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ অধীক্ষককে।

রাজ্যভিত্তিক মোটর দুর্ঘটনার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে ২০১৫ সালে অসমে মোটর দুর্ঘটনা হয় ৬, ৯৫৯টি, মারা যান ২,৩৯৭ জন এবং জখম হন ৭,০৬৮ জন। তার মধ্যে অসমের জাতীয় সড়কে মোট মোটর দুর্ঘটনা ঘটে ৩,৩৫৩টি এবং জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনায় মারা যান ১, ৪২৭ জন এবং জখম হন ৩,৪৪৬ জন। অন্যদিকে রাজ্য-সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালে ১,৮৯৮টি এবং দুর্ঘটনায় রাজ্য সড়কে মারা যাওয়া ব্যক্তি হচ্ছেন ৫৮৪ জন এবং রাজ্য সড়কে জখম হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা হচ্ছে ১,৯৯৯ জন। পশ্চিমবঙ্গে মোটর দুর্ঘটনা হয় ১২,৮৭৫টি, মারা যান ৬,২৩৪ জন এবং জখম হন ১২,০১৮ জন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় সড়কে মোট মোটর দুর্ঘটনা ঘটে ৪,২৮৮টি এবং জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনায় মারা যান ২,২৪৩ জন এবং জখম হন ৪,২৭০ জন। অন্যদিকে রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে ২০১৫ সালে ৩,৮০২টি এবং দুর্ঘটনায় রাজ্য সড়কে মারা যাওয়া ব্যক্তি ১,৭৪১ জন এবং রাজ্য সড়কে জখম হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ৩,৩৯৫ জন। পথে দুর্ঘটনার নিরিখে সমগ্র দেশের মধ্যে ২০১৫ সালে যে রাজ্যগুলি প্রথম পাঁচটি স্থান লাভ করেছে সেগুলি হচ্ছে— তামিলনাড়ু (৬৯, ০৫৯), মহারাষ্ট্র (৬৩,৮০৫), মধ্যপ্রদেশ (৫৪,৯৪৭), কর্ণাটক (৪৪,০১১), কেরল (৩৯,০১৪)। ২০১৫ সালের জাতীয় ক্রাইম রেকর্ডের রিপোর্ট মতে শুধুমাত্র ড্রাইভারের দোষে সমগ্র দেশে দুর্ঘটনা হয় প্রায় ৭৭ শতাংশ এবং তারমধ্যে প্রায় ৪ শতাংশ ড্রাইভার মদ বা অন্য কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ফলে দেশে দুর্ঘটনা ঘটে। সুপ্রিমকোর্টের এই যুগান্তকারী রায়ের ফলে জাতীয় বা রাজ্য সড়কে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে সেটা আগামীদিনে কিছুটা হলেও কমবে। কমবে মদ্যপ যাত্রীদের চোর, ডাকাত, প্রতারকদের কাছে প্রতারিত হওয়া।

কিন্তু কেউ কেউ সমালোচনা করে বলছেন যে, আইন করে কতটুকু মদ খাওয়া নিষিদ্ধ হবে। কেননা জাতীয় সড়কগুলির পাশে শুধু লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানে মদ বিক্রি হয় তা নয়, এছাড়াও বিভিন্ন বিভিন্ন ধাবা, হোটেল, ঝুপড়িতে মদ বিক্রি হয়। দুরপাল্লার গাড়ির ড্রাইভারকে হোটেল মালিক পুরস্কার হিসাবে মদ খাওয়ান। লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান বন্ধ হয়ে গেলেও হোটেলে অতিরিক্ত দাম দিয়ে মদ বিক্রি বাড়বে না সেটার কি নিশ্চয়তা রয়েছে? কেউ যদি গাড়ির ভিতরে করে মদ নিয়ে আসেন সেটা কেমন করে নিয়ন্ত্রণ হবে। সে যাই হোক সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশের ফলে বলা যায় জাতীয় ও রাজ্য সড়কে কিছুটা হলেও মদ বিক্রি ও খাওয়া কমবে। সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে হলে এই ব্যাপারে গ্রাম-গঞ্জে-শহরে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার কর্তৃক সমগ্র দেশে সচেতনতা বাড়াতে হবে। কিন্তু দেশের রাজ্য সরকারগুলি এই ব্যাপারে কতটুকু পদক্ষেপ নেবে সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মদ খেয়ে মারা গেলে আড়াই লক্ষ করে টাকা দেওয়া হয়। তাইতো পঞ্জাবে রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছিল জাতীয় সড়কের পাশে মদ বিক্রির উপর কড়াকড়ি না করার জন্য। এতে তাদের রাজস্বের ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন--- 'আপনাদের রাজ্যে মদ ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠী শক্তিশালী হওয়ায় আপনারা জাতীয় সড়কের পাশে প্রচুর মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে রেখেছেন। এর থেকে আয় হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের শুল্ক দপ্তর খুব খুশি। তাই দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু হলে আপনারা এক-দেড় লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়ে দেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের কিছু সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। সরকারের উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা'। বেঞ্চ পঞ্জাব সরকারকে তিরস্কার করে আরো বলে যে— 'একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন, কতগুলি মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়েছেন আপনারা।' বেঞ্চ কেন্দ্র সরকারকেও তিরস্কার করে বলে যে, বিগত ১০ বছর ধরে এই ব্যাপারে আপনারা কোনো পদক্ষেপ নেননি। তাই এখন দেখার বিষয়, সমগ্র দেশের রাজ্য সরকারগুলি এবং কেন্দ্র সরকার এই ব্যাপারে তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কতটুকু এগিয়ে আসে। দেশের বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের পাশে গজিয়ে উঠা মদের দোকান এবং বড় বড় বিজ্ঞাপন, ব্যানার কবে সরিয়ে দেওয়া হয় সে ব্যাপারে আমাদেরও চোখ খোলা রাখতে হবে, নতুবা লিকার লবির সঙ্গে মিলে স্থানীয় প্রশাসন বা রাজ্য প্রশাসনগুলি দিনের পর দিন সেই অবৈধ ব্যবসা সড়কের পাশে চালিয়ে যাওয়ার পথ খোলা রাখবে এবং সড়কের নিরাপাত্তাও বাড়বে না। এছাড়াও এই সংক্রান্ত আমাদের পুরনো অভিজ্ঞতাও বেশি সুখকর নয়। মনে রাখতে হবে, সুপ্রিমকোর্টের দেওয়া ডেডলাইন হচ্ছে--- ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

সংশোধিত প্রতিবন্ধী বিলে আশার আলো

মাধবী মুখার্জী

প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিশু বলতে বোঝায় অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে, চিকিৎসাজনিত ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কারও শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় বা তুলনামূলকভাবে কম হয় ও জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্বাভাবিক কাজকর্ম বা চিন্তা করতে যাদের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তারাই প্রতিবন্ধী বা অসমর্থ। আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সাধারণ মানুষ যে কাজগুলো করতে পারে, শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারাটাই হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবন্ধকতার কোনো প্রতিষেধক না থাকলেও আছে প্রতিরোধের উপায়। সেক্ষেত্রে প্রতিরোধের জন্য প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা খুবই জরুরি। দুর্ঘটনাজনিত কারণে মানুষ বয়সের যে-কোনো স্তরে প্রতিবন্ধী হতে পারে। এছাড়া অন্যান্য যে কারণে প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম নিতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কম বা বেশি বয়সে সন্তানধারণে মায়ের অপুষ্টিজনিত সমস্যা, গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের রোগাক্রান্ত বা দুর্ঘটনার শিকার হওয়া, ভুল চিকিৎসা গ্রহণ, প্রসবকালীন সমস্যা, শিশু কিংবা শিশু জন্মের পর রোগাক্রান্ত হওয়া বা মাথায় আঘাত পাওয়া অথবা অপুষ্টির শিকার হওয়া। অজানা অনেক কারণেও শিশু প্রতিবন্ধী অথবা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বা অসমর্থ হতে পারে। জন্মের সময় মস্তিষ্কের বিন্যাসগত অসামঞ্জস্য অথবা জিনগত অস্বাভাবিকতা-সহ জন্ম নিলে শিশু প্রতিবন্ধী হয়। প্রতিবন্ধী হওয়ার যেসব কারণ আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এজন্য প্রতিবন্ধকতার কারণগুলো যেমন জানতে হবে তেমনি সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। শারীরিকভাবে অসম্পূর্ণ মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহাযোগিতা প্রদর্শন ও তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতিবন্ধীদের দিব্যাঙ্গ নামে অভিহিত করেছেন।

বহু বিচিত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও ক্রমবর্ধমান যন্ত্রনির্ভরতা ও শিল্পায়নের সঙ্গে পোলিও, ছোঁয়াচে ও জন্মগত রোগের কারণে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড যানসমস্যার ফলে দেখা দিচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা। ভিটামিন এ জনিত এবং পুষ্টিজনিত ঘাটতির পরিমাণে দেখা দিচ্ছে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ক্ষয়। তিনটি প্রধান ঘাটতি যেগুলি এই ধরনের এক বা একাধিক ঘটনার

> পূর্বতন আইনে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো ধারা ছিল না। নতুন আইনে এই ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এককথায়, ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বরে পাশ হওয়া বিল শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনে একরাশ আশার আলো দেখালো।

ফলে দেখা দিচ্ছে।

ভারত সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য বহু সুবিধা ও ছাড়ের ব্যবস্থা করেছেন। সেইসব সুবিধা ও ছাড়ের সুযোগ পৌঁছে দিতে প্রতিবন্ধকতার আদর্শ সংজ্ঞা স্থির করা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী কল্যাণের জাতীয় পর্ষদের সুপারিশ অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবার মহানির্দেশকের সভাপতিত্বে বিভিন্ন কার্যালয়গুলিতে প্রতিবন্ধকতার আদর্শ সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। সেগুলিকে দেশ জুড়ে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। শারীরিক ক্রটি ডেকে আনে দৈহিক সীমাবদ্ধতা এবং দৈহিক সীমাবদ্ধতার শেষ পরিণতি অসামর্থ্য। শারীরিক ক্রটি অর্থে বোঝাবে একটি স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী মনস্তাত্ত্বিক অথবা কোনো অস্বাভাবিকতা। দৈহিক ক্রটির ফলে দেখা দিতে পারে মাংসপেশী সঞ্চালন, মস্তিষ্ক সংবেদনসম্বন্ধীয় ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া। এর ফলে দেখা যায় আংশিক বা সম্পূর্ণ অক্ষমতা। শারীরিক অক্ষমতা স্বল্পকালীন হতে পারে, আবার দীর্ঘকালীনও হতে পারে। অর্থাৎ চিরস্থায়ী ক্রটি যেমন বিরল নয়, তেমনি আরোগ্যের সম্ভাবনাযুক্তও হতে পারে।

অসামর্থ্য বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট মানুষের বয়স, লিঙ্গ এবং আদর্শ সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী এক বা একাধিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করার পক্ষে তার বর্তমান অসুবিধা। আইনি অর্থে অসামর্থ্য বলতে বোঝায় দেহের কোনোরকম স্থায়ী আঘাত যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হতে পারে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে নাও হতে পারে। অসামর্থ্যকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সাময়িক পূর্ণ অসামর্থ্য— যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে কাজ করতে অসমর্থ। এই পর্যায়ে অস্থি সংক্রান্ত, চক্ষু সংক্রান্ত, শ্রবণ সংক্রান্ত এবং বাক্‌শক্তিজনিত সমস্যার কারণে কোনো ব্যক্তি চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো সাময়িক আংশিক অসামর্থ্য। এটা সেই পর্যায় যেখানে আরোগ্যের ক্ষেত্রে যা উন্নতি ঘটেছে তার ভিত্তিতে সেই ব্যক্তি লাভজনক কোনো পেশাতেও নিযুক্ত হতে পারেন।

তৃতীয় পর্যায়ে স্থায়ী অসামর্থ্য বলতে বোঝায় চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ও সার্বিক উন্নতিলাভের পর শরীরের এক বা একাধিক কোনো স্থায়ী ক্ষতি অথবা তৎজনিত হানি। এই সম্পর্কিত শর্তগুলিও অপরিবর্তনীয়। শুধুমাত্র স্থায়ী অসামর্থ্যের জন্যই শ্রেণীবিভাজন এবং বিভিন্ন ছাড়ের সুপারিশ করা হয়েছে।

ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যাঁদের প্রতিবন্ধী হিসেবে ঘোষণা করা হবে তাঁদের পরিচয়পত্র প্রদান করা এবং এই রাজ্যে প্রতিবন্ধীদের জন্য সমপ্রকৃতির একগুচ্ছ সংজ্ঞা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়েই তাঁরা বিভিন্ন সুবিধা ও ছাড়ের সুযোগ পেতে পারেন। প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণে ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রমাণপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে গঠিত বোর্ড স্থায়ী অসামর্থ্য প্রমাণপত্র প্রদান করবে। অসামর্থ্য নির্ধারণের জন্য জেলা পর্যায়ে একটি মেডিকেল বোর্ড থাকতে হবে। বোর্ডে থাকবেন জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক অথবা মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ, শল্যচিকিৎসক, বাক্‌শক্তি ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন নাক-কান-গলার শল্যচিকিৎসক অথবা কায়িক ওষুধ ও পনর্বাসনের একজন বিশেষজ্ঞ, মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা একজন রোগী পরীক্ষাসংক্রান্ত মনোবিদ অথবা বিশেষ শিক্ষাক্রমে একজন শিক্ষক। প্রতিবন্ধকতার সমস্যাটি কেবলমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা নয়, বরং একটি সামাজিক সমস্যা। ২০১১ সালের জনগণনায় আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ১০ হাজার ৫৫৭ জন। যদিও সংখ্যাটা বাস্তবে আরো অনেক বেশি। নিষ্ঠুর সত্যের মতোই এই পর্বতসদৃশ সমস্যা আমাদের সামনে রয়েছে। এই সব প্রতিবন্ধী মানুষ আমাদের সমাজের এক অপরিহার্য অংশ। এদের বাদ দিয়ে সমাজ কোনোভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। সঠিক চিকিৎসা করে কখনো কখনো কোনো কোনো প্রতিবন্ধীকে সারিয়ে তোলা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার দ্বারা তাদের স্বনির্ভর করে তোলাই আমাদের কর্তব্য। তাদের প্রতি করুণা বা দয়া প্রদর্শন না করে, তাদের সামাজিক পাপ মনে না করে তাদের প্রতি বন্ধুর মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষা ও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে।

১৯৮৯ সালটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে। ১৯৮২-১৯৯২-এর দশকটি চিহ্নিত হয়েছিল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দশক হিসেবে। ১৯৯২ সালে ৩ ডিসেম্বর থেকে বিশ্ব জুড়েই পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস।

Rights of Persons of Disabilities Bill-2016, ১৪ ডিসেম্বর সংসদে গৃহীত হয়েছে। ১৯৯৫ সালের বিলটিতে মাত্র ৭টি বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বরের সংশোধিত বিল অনুযায়ী অক্ষমতার সংখ্যা ৭টি বিষয়ে বাড়িয়ে ২১টি করা হয়েছে। যার মধ্যে সেরিব্রাল পালসি, হিমোফিলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, পার্কিনসন রোগী, এমনকী অ্যাসিড আক্রান্তকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৯৫ সালের আইনে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে ৩ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল। ২০১৬-র নতুন আইনে ৪ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে। সরকারি ভবনগুলির পাশাপাশি বেসরকারি ভবনেও অনায়াসে যাতায়াতের সুবিধার কথা বলা হয়েছে। পূর্বতন আইনে আইন না মানলে কোনো শাস্তির প্রতিবিধান ছিল না। নতুন বিল অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করলে তার বিরুদ্ধে দু' বছরের হাজতবাস এবং সর্বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানার সুপারিশ করা হয়েছে। পূর্বতন আইনে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো ধারা ছিল না। নতুন আইনে এই ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এককথায়, ২০১৬ সালের ১৪ ডিসেম্বরে পাশ হওয়া বিল শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জীবনে একরাশ আশার আলো দেখালো। ■

অন্য রকম

বহুজাতিকের চাকরি ছেড়ে গ্রামের সরপঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্বের বহু দেশের মন্ত্রী-রাষ্ট্রদূতেরা গোড়ায় বিশ্বাসই করতে পারেননি। কিন্তু যখন রাষ্ট্রপুঞ্জ আয়োজিত একাদশ ইনফো-পভার্টি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সের চেয়ারম্যান নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন তখন বিশ্বাস হলো। জিন্সপরিহিতা ওই মহিলার নাম ছবি রাজাওয়াত। হঠাৎ দেখলে কোনো মডেল বা নিদেনপক্ষে বলিউডের অভিনেত্রী বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু আদতে তিনি রাজস্থানের সোডা গ্রামের নির্বাচিত সরপঞ্চ। পড়াশোনা করেছেন অন্ধ্র প্রদেশের ঋষিভ্যালি স্কুলে। স্নাতক স্তরের পড়াশোনা আজমেঢ়ের মেয়ো গার্লস কলেজে। তারপর পুনের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব মডার্ন ম্যানেজমেন্ট থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন। যে গ্রামে জন্মেছেন তার ভার নেওয়ার আগে বিখ্যাত বহুজাতিক ভারতী টেলিভেঞ্চার্সের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছিলেন। গ্রামোন্নয়নের কাজ করবেন বলে ছবি এমন লোভনীয় চাকরি ছাড়তেও দ্বিধা করেননি।

জয়পুর থেকে মাত্র ৬০ কিলোমিটার দূরে হলেও সোডাকে অজ পাড়াগাঁ বললে কোনো ভুল হবে না। রাজস্থানের এই প্রত্যন্ত গ্রামের বেশিরভাগ বাড়ি মাটি দিয়ে তৈরি। মুষ্টিমেয় কিছু বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো চোখে পড়ে। গ্রামের সার্বিক সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশের ঢের নীচে। প্রতি বছর খরার ভয়ে গ্রামের লোকেরা একরকম সিঁটিয়ে থাকেন। ছবি এসব কথা জানেন। এ গ্রামেই তাঁর জন্ম। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের উন্নয়ন যে গতিতে হয়েছে তাই যদি চলতে থাকে তা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, স্কুল, চাকরি— আমরা কিছুই মানুষকে দিতে পারব না। আশার কথা, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কাজের একটা পরিবেশ গড়ে তুলেছে।' ছবি জোর দিয়েছেন জল সংরক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিকাশি ব্যবস্থা, বনসৃজন এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ওপর। ছবি বলেন, 'গত দু'বছরে আমরা এখানে অনেক কাজ করেছি। বাইরের কেউ আমাদের সাহায্য করেনি। না কোনো এনজিও, না পাবলিক বা প্রাইভেট সেক্টর। আমরা যা করেছি সবই নিজেদের চেষ্টায়।' সম্প্রতি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করায় রাষ্ট্রপুঞ্জ সোডায় একটি অংশীদারি অফিস (ইউএনওপি) স্থাপন করেছে। যার দায়িত্বে রয়েছেন বাবুলাল জৈন। ছবি বলেন, 'আমি টাকা চাই না। যে সব সংস্থা কাজ করতে চান তারা নিজেরাই প্রকল্প তৈরি করে কাজ করুন। অনেক সময় মাটির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকার ফলে নানান প্রকল্প ব্যর্থ হয়। গ্রাউন্ড রিয়ালিটির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আছি। তাই বিনা দ্বিধায় চলে আসুন।'

গ্রামের লোকেরাও তাদের সরপঞ্চের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ৩০ বছর বয়েসি কৃষক জয় সিং বলেন, 'উনি গ্রামের জন্য যা করেছেন তা কেউ কোনোদিন করেননি।' একই রকম কথা শোনা গেল ২৫ বছরের মহম্মদ সাদেকের মুখেও। ছবির চেষ্টায় গ্রামে গড়ে উঠেছে কম্পিউটার ট্রেনিং স্কুল। সেই প্রসঙ্গে সাদেক বলেন, 'গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে এটা একটা বিরাট সুযোগ। আগে এসব কেউ করা তো দূর, ভেবেও দেখেনি।' বস্তুত সোডায় আধুনিকতার জোয়ার এসে গেছে। ছবি গ্রামের লোকেদের নিয়মিত মেডিক্যাল চেক-আপের ব্যবস্থা করেছেন। তার চেষ্টায় এবং উদ্যোগে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শাখা হয়েছে সোডায়।

পঞ্চায়েত অফিসে ছবি রাজাওয়াত।

সাধারণ মানুষের ভালোবাসা যেমন ছবি পেয়েছেন, ঠিক তেমনই পেয়েছেন সরকারি আমলাদের সহযোগিতা। জেলা কলেক্টর মুক্তানন্দ আগরওয়াল বলেন, 'ওর মতো মানুষ হয় না। একটা ভিশন আছে ওর। ওর মতো মানুষ যত কাজ করতে আসবেন তত দেশের উন্নতি হবে।' স্থানীয় একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ভাস্কর পেটশালি বলেন, 'উনি খুবই স্বচ্ছ মনের রাজনীতিবিদ।'

চারিদিকে এত প্রশংসা। কোথা থেকে এত প্রেরণা পান? ছবি হাসেন। বলেন, 'আপনার শেকড়ই হলো আপনার ভিত। যদি আপনি শেকড় বাঁচাতে চান বা তাকে আরও মজবুত করতে চান তা হলে আপনার প্রেরণার অভাব হবে না। আমার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।' ∎

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

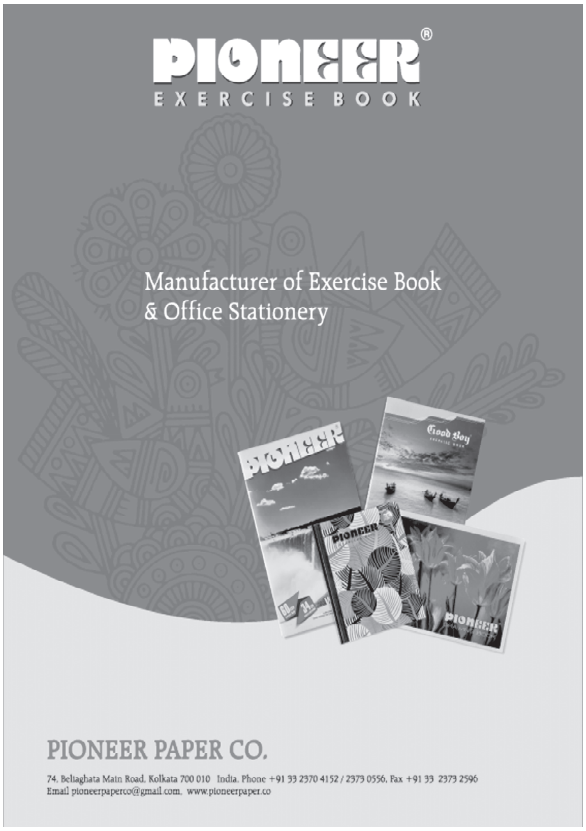

"মহত্ত্ব, সমন্বয়, সৌন্দর্য— এসব ধর্মজীবনের ফলস্বরূপ; এ শিক্ষা আমরা তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কাছে পাই। ঐ সকল নিয়ে আমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। কিন্তু সরলতা, আন্তরিকতা, পূর্ণভক্তি প্রভৃতি (ধর্মজীবন গঠনের) অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক গুণগুলি, যা আমাদের অন্তরের অতি নিকটে রয়েছে— সেসব বিষয়ে যত্ন নিতে হবে।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

মুক্তিসাধনার ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

একজন সাহিত্যিকের কলমে ইতিহাস কেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে তারই নজির রেখেছেন লেখক। সমস্ত তথ্য নিখুঁত ভাবে চয়ন করে লেখক ঘটনাক্রমকে বিন্যস্ত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মহান জীবনসাধনার দিকগুলি সাবলীল ভাবে ফুটেছে এই গ্রন্থে। নেহাত এক ব্যক্তির জীবনচর্চা নয়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের নিরিখে সাবলীল ভাষায় বিধৃত হয়েছে তাঁর জীবন ও জীবনদর্শন। ইতিহাস হলো সমাজ ও সময়ের মেলবন্ধন। শ্রীঅরবিন্দ কীভাবে তাঁর সময় ও কালের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন তার নিখুঁত ও হৃদয়স্পর্শী আলোচনা গ্রন্থের দুই মলাটের মাঝে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের লেখার অংশবিশেষ পরিবেশন করে লেখক শ্রীঅরবিন্দের সংগ্রামী মানসিকতার দিকগুলি চিহ্নিত করেছেন।

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় ঝড়ের মাতন সৃষ্টি হয়েছিল। চিন্তাবিদ বিনয় সরকার এই উত্তাল সময়কে 'বঙ্গবিপ্লব' বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বদেশপ্রেম এক প্রগাঢ় ঘনীভূত রূপ গ্রহণ করেছিল। অচিরেই শুরু হলো অগ্নিসাধনা এবং শ্রী অরবিন্দ এই অগ্নিসাধনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন।

লেখক শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই বিবর্তন তাঁর ব্যক্তিজীবনে রূপায়িত হলেও তা ছিল কালের প্রতিবিম্ব। শ্রী অরবিন্দ কালের যাত্রার ধ্বনি আহরণ করেছিলেন এবং তারই সার্থক প্রতিধ্বনি অনুরণিত হয়েছিল তাঁর জীবনে। লেখক তাঁর গ্রন্থে অরবিন্দের জীবনচরিতের যে ছবি এঁকেছেন, তার প্রবাহে তিনটি সুস্পষ্ট পর্বের সমাবেশ ঘটেছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র। ইংল্যান্ডে তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছিল। ভারতে ফিরে এসে বরোদা রাজ্যের প্রশাসনিক পদে যোগদান করেন এবং অচিরেই শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন। অরবিন্দের জীবনে মূল তিনটি পর্ব হলো— (১) ১৮৭২-১৮৯৩, (২) ১৮৯৩-১৯০৫, (৩) ১৯০৬-১৯১০ এই তিনটি পর্বে ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্রে

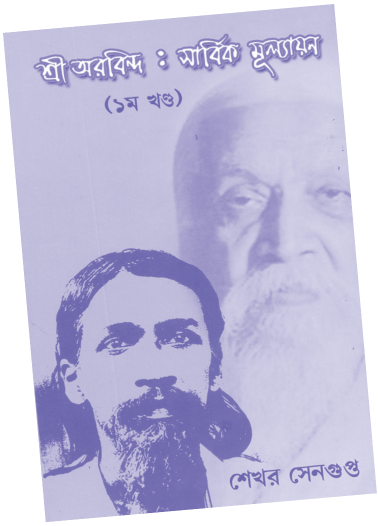

ও তার বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল।

ঊনিশ শতকের শেষদিকে ভারতের অবস্থা কেমন ছিল? তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নকাল। ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্ন। ব্রিটেনের সমৃদ্ধি ও শক্তি ভারতের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। তাই ব্রিটেন নিজদেশে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক ভাবধারার অনুশীলন করলেও ভারতের ক্ষেত্রে তার আচরণ ছিল কর্তৃত্ববাদী ও অমানবিক। ভারতে ব্রিটেন 'অ-ব্রিটিশ' শাসন কায়েম করেছিল। পুঁজিপতি শ্রেণী ও আমলাতন্ত্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল ও উদারনৈতিক দলের মধ্যে ভারত সম্পর্কে মনোভাবে কোনো ফারাক ছিল না।

কিন্তু ভারতীয়দের মনোভাব কেমন ছিল? পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রিটিশ ভজনায় মুখর ছিল। ফলত অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি ভারতের রাজা মহারাজা জমিদার ও শিক্ষিত চাকুরিজীবী মানুষ ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'ইংরেজ স্তোত্র' শীর্ষক লেখায় ভারতীয়দের দাসসুলভ মনোভাব তুলে ধরেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর্থিক দুর্দশা ও অবিচারের জালে আবদ্ধ ছিল। ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বরেণ্য নেতা লালা লাজপত রায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে (১৯২৮ খ্রি.) একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যার নাম ছিল 'Unhappy India'। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে জাতীয় আত্মপরিচয়ের ভাবনা জাগ্রত হয়। ভারত কি ঘুমিয়ে রবে? এই প্রেক্ষিতে সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হলো। ভারতসভা ও জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই প্রচেষ্টার পরিণতি।

ব্রিটিশ শাসনের জনবিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া দিল তিন ধরনের। প্রথমে ছিল শিক্ষিত ও বিত্তবান শ্রেণীর অকুণ্ঠ সমর্থন। পরের ধাপে সংস্কারবাদী ও সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদ। শেষে দেখা ছিল ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধমূলক সক্রিয় জাতীয়তাবাদ। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে মুখ খুললেও তাঁরা সংস্কারের পথ গ্রহণ করেন।

সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদীদের ‘কাপুরুষ’ ও তাঁদের কর্মপন্থাকে ভিক্ষাবৃত্তি বলা হলেও তাঁদের স্বদেশপ্রীতি ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

কিন্তু ইতিমধ্যেই শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ বিরোধী চাপা ক্ষোভ নির্গত হতে শুরু করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ স্বামী বিবেকানন্দের দেশবাসীর প্রতি বলিষ্ঠ বরাভয় মন্ত্র শিহরণ সৃষ্টি করল। ১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় New Lamps for Old শীর্ষক লেখায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের আপোশমুখী ও সংস্কারবাদী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে কংগ্রেস মুষ্টিমেয় বিত্তবান শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান, তাই সঠিক অর্থে ‘জাতীয়’ সংগঠন বলা যায় না। শ্রী অরবিন্দ যখন সরাসরি কংগ্রেসের চরিত্র ও নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করছিলেন, সেই সময়েই মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলক গণপতি উৎসবের আয়োজন করেন (আগস্ট ১৮৯৩)। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা সঞ্চালিত হয়। শ্রীঅরবিন্দের পারিবারিক পরিমণ্ডলেও পরিবর্তন ঘটেছিল। দাদামশাই রাজনারায়ণ বসু ছিলেন স্বাদেশিকতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক। সঞ্জীবনী পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের সময় জনমত গঠনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

এদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বেই শ্রী অরবিন্দ বিপ্লব সাধনা ও যোগসাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। লেখক তাঁর গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে শ্রী অরবিন্দ এই দুটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরে নিরালম্বস্বামী) সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে। বরোদায় থাকার সময় ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেও তাঁর মত বিনিময় হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর তাঁর কর্মক্ষেত্র বরোদা থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৬ সালের আগস্টে কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে অধ্যক্ষপদে যোগ দিলেন। এই সময় কংগ্রেসে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে প্রভাবশালী বিকল্প গোষ্ঠী গড়ে উঠল। লাল-বাল-পাল হলেন এই গোষ্ঠীর কর্ণধার। আর শ্রীঅরবিন্দ বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণা তুলে ধরতে লাগলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি দেশ বা জাতির প্রাণবায়ু, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোনো দেশ বা জাতির সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। ১৯০৮ সালের ২৮ এপ্রিল খোলাখুলি লিখলেন শান্তিপূর্ণ পথে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বেছে নিতে হবে ভয়াবহ বিপ্লবের পথ এবং সেজন্য যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সঙ্গে অরবিন্দের বক্তব্যের আশ্চর্য মিল। স্বামীজী ছিলেন ফলিত বেদান্তের প্রবক্তা, ধর্মের মাধ্যমে জাতির সামাজিক ব্যাধি ও তামস নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ফলিত বেদান্ত থেকে শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক বেদান্তের অমোঘ বাণী প্রচার করলেন। ক্ষত্রিয় রণনীতির পথ ঘোষণা করলেন। শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পাল দুজনেই বললেন স্বরাজের লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে আধ্যাত্মিক পথেই এগোতে হবে। বিপিন পাল আধ্যাত্মিক ভাবনাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রধানভিত্তি বলে চিহ্নিত করেছেন।

শেখর সেনগুপ্ত তাঁর লেখায় আলিপুর বোমার মামলা প্রসঙ্গে সবিস্তার লিখেছেন। এই বোমার মামলার সূত্র ধরেই অরবিন্দ অগ্নিসাধনার ক্ষেত্র থেকে যোগসাধনার মহতী পরিসরে প্রবেশ করলেন।

আলিপুর বোমার মামলা থেকে খালাস পাবার পরেও ব্রিটিশ সশাসকগোষ্ঠী কড়া নজরদারির জাল ফেলেছিল। বিভিন্ন স্থানে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু নিয়ে সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ গোপন ফাইল তৈরি করে (নথি নং ২৫০ এ/১৯০৯ রাজনৈতিক বিভাগ (গোপন)। উত্তরপাড়া ভাষণে (৩০ মে ১৯০৯) শ্রীঅরবিন্দ সনাতন ধর্মকে জাতীয় মুক্তি ও বিকাশের একমাত্র পথ বলে অভিহিত করেছেন। আবার হাওড়ার ভাষণে মত প্রকাশের অধিকার ও সঙ্ঘ গঠনের কথা বলেছেন। ১৯০৯ এর সেপ্টেম্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে অসহযোগিতার (no co-operarion) বক্তব্য তুলে ধরলেন।

ব্রিটিশ শক্তি আশঙ্কিত হয়ে উঠল। অরবিন্দকে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। অরবিন্দ ব্রিটিশের সিদ্ধান্ত আঁচ করতে পেরে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চলে গেলেন তারপর পাড়ি দিলেন পণ্ডিচেরীর পথে। অগ্নি সাধনা থেকে যোগসাধনার স্তরে শ্রীঅরবিন্দর উত্তরণ ঘটল। এখানেই লেখকের প্রথম খণ্ডের আখ্যান শেষ হলো।

লেখকের তথ্যচয়ন ও আখ্যানের বিন্যাস প্রশংসনীয়। তবে গ্রন্থটির কয়েকটি সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক জায়গায় বানানের ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ল। আর তথ্যের ক্ষেত্রেও ভুল লক্ষ্য করলাম। ৮২ পৃষ্ঠায় যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঘাযতীন বলে উল্লেখ রয়েছে। বাঘা যতীনের নাম যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। ১৪৩ পৃষ্ঠায় ‘স্ট্রং হিন্দু টিচিং’ বলা হয়েছে— হবে ‘স্ট্রং হিন্দু টিন্জ’ (Strong Hindu Tinge)। ‘জওহরলাল নেহেরু’ না বলে জওহরলাল নেহরু বলা যুক্তিসঙ্গত। গ্রন্থটিতে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্রের ভূমিকা স্থান পায়নি। আর রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অবদান উল্লেখিত হয়নি। বরোদা থেকে অরবিন্দ সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে অতিথি হয়ে উঠেছিলেন আর তাঁর সাহায্যে বন্দে মাতরম্ পত্রিকার প্রকাশ সম্ভব হয়। এসব ত্রুটি সত্ত্বেও অরবিন্দের সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক সঠিক ভাবেই ধর্মীয় প্রেরণা ও জাতীয়তাবাদের নিবিড় যোগসূত্র চিহ্নিত করেছেন।

শ্রী অরবিন্দ : সার্বিক মূল্যায়ন (১ম খণ্ড)। লেখক : শেখর সেনগুপ্ত। প্রকাশক : প্রিটোনিয়া পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটরস্। মূল্য : ২৫০ টাকা।

সংস্কার ভারতী আয়োজিত নৃত্যসন্ধ্যা

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত 'নৃত্যসন্ধ্যা' গত ১৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায় মহাজাতি সদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল গৌড়ীয় নৃত্যের মাধ্যমে মেঘনাদ বধ কাব্যের উপস্থাপনা। পরিচালনায় ছিলেন ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতী সংযুক্তা সেনগুপ্ত পরিচালিত সৃজনশীল নৃত্য ভঙ্গিমায় নবরসেশ্রীকৃষ্ণ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে সংস্কার ভারতী সর্বভারতীয় ভাবসঙ্গীত 'সাধয়তি সংস্কার ভারতী' নৃত্যসহ পরিবেশন করেন সিউড়ি শাখার শিল্পীবৃন্দ। শ্রীমতী মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্তের পরিচালনায় শিল্পীরা রবীন্দ্রনৃত্য আঙ্গিকে উপস্থাপনাটি মঞ্চস্থ করেন। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশি নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী অলকানন্দা রায়, বিশিষ্ট কথক শিল্পী শ্রীমতী অমিতা দত্ত, নৃত্যসাধক কোহিনূর সেন বরাট। শ্রীমতী অমিতা দত্ত তাঁর বক্তব্যে সংস্কার ভারতীর সর্বভারতীয় সঙ্গীতটির নৃত্যসহ উপস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এই নৃত্যটি কত্থক আঙ্গিকে মঞ্চস্থ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দু' হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি যা বিভিন্ন প্রজন্মের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে, সেই সংস্কৃতিকেই সংস্কার ভারতী নবরূপে প্রকাশ করছে। সংস্কার ভারতীর এই প্রচেষ্টাকে তিনি অভিনন্দন জানান।

শ্রীমতী অলকানন্দা রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বর্তমান যে নৃত্যভঙ্গীমাগুলি দেখা যাচ্ছে প্রায়শই তা অ্যাক্রোব্যাটিক মুভমেন্ট'। নৃত্যের পোশাকের সঠিক ব্যবহারও হচ্ছে না। যে কালচার মানুষকে রিফাইন করে না, তাকে কালচার বলা যায় না। সমাজের মানুষকে একযোগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে টিআরপি ভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখব না। সংশোধনাগারে অনুষ্ঠানে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সর্বত্রই তাঁর প্রচেষ্টা থাকে ভারতীয় নৃত্যকলার শিক্ষাদানের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতির রুচি নির্মাণ করা।

শ্রী কোহিনূর সেন বরাটের অভিমত নৃত্য শিখলেই 'নৃত্যবিদ' হওয়া যায় না। তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য চর্চা করলে রবীন্দ্রনৃত্য সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। মাতৃভূমির শিক্ষা-সংস্কৃতিকে আগে জানতে হবে, তারপর অন্য শিক্ষা-সংস্কৃতিরও চর্চা করতে হবে। সংস্কার ভারতীর মতো প্রতিষ্ঠানকে পুষ্ট করতে পারলে তবেই ভারতীয় সংস্কৃতি বাঁচবে। বিশিষ্ট অতিথি-সহ মঞ্চে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত সভাপতি তপন গাঙ্গুলী, অন্যতম সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাস, অন্যতম উপদেষ্টা বিকাশ ভট্টাচার্য, কার্যকারী উপদেষ্টা সুভাষ ভট্টাচার্য। সভাপর্ব

সমাবেশ সমাচার

পরিচালনায় ছিলেন প্রান্ত সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বটি সম্পন্ন করেন প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু। তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। সাংস্কৃতিক পর্বটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুমনা পাল ভট্টাচার্য।

মঙ্গলনিধি

গত ১২ ডিসেম্বর '১৬ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ-কার্যবাহ শ্রীমন্ত চন্দ্রের ২৫তম বিবাহ বার্ষিকীতে নিজের বাড়িতে এক ছোট্ট অনুষ্ঠানে সহ-প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়ের হস্তে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। পুরনো ও নতুন বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে বিশ্বনাথ দত্ত

গত ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সঙ্ঘকার্যালয় মাধব ভবনের কার্যালয় প্রমুখ বিশ্বনাথ দত্ত হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালিক কার্যকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই গ্রামের তিনি স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের মেদিনীপুর বিভাগের তৎকালীন বিভাগ কার্যবাহ প্রয়াত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণায় তিনি স্বয়ংসেবক হন। কিছুদিন সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবেও কাজ করেন। কাঁথিতে তাঁর পরিবারের প্রদত্ত জমিতেই বর্তমান সঙ্ঘকার্যালয় গড়ে উঠেছে। নীরব সদাহাস্যময় অকৃতদার এমন একজন স্বয়ংসেবকের আকস্মিক প্রয়াণে সকলেই শোকাহত।

‘শ্রদ্ধা’র ৮২তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ৪ ডিসেম্বর সিউড়ী সঙ্ঘ কার্যালয় কেশবতীর্থে সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক গজানন রাও বাপটজীকে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র ৮২তম শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান তিন বার ওঙ্কার ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলন দ্বারা শুভ সূচনা করা হয়। মঙ্গলদীপ প্রজ্বলন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সিউড়ী শাখার নবীন ব্রহ্মচারী গৌতম মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সিউড়ী কেন্দ্রীয় উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক ও স্বয়ংসেবক শুভাশিস কর্মকার। শ্রী বাপটজীকে মাল্যভূষিত করেন সিউড়ীর প্রবীণতম স্বয়ংসেবক পূর্ণচন্দ্র দাস বড়াল। মানপত্র পাঠ করেন সুব্রত সিনহা। শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ ‘শ্রদ্ধা’র পক্ষ থেকে শ্রীবাপটজীকে গীতা, শাল, পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয়, ফল ও মিষ্টান্ন প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। উল্লেখ্য, শ্রীবাপটজীর অনুপ্রেরণায় সিউড়ী শহরে শিশু মন্দিরের শুভারম্ভ হয়। শিশু মন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করেন অরবিন্দপল্লী ও তিলপাড়া শিশু মন্দিরের প্রধান আচার্য ও আচার্যারা। সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল ও বিভাগ কার্যবাহ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল তাঁদের ভাষণে ‘শ্রদ্ধা’ সংগঠন হিন্দু সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধার ভাব জাগরণের কাজ করছে তার ব্যাখ্যা করেন। বাপটজী তাঁর অনুভব কথনের মধ্যে বলেন, ‘শ্রদ্ধার দ্বারা সমাজে সেবার ভাব জাগ্রত করতে হবে।’ অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা ও প্রবীণ স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধার ৭৫ জন অনুদানীও উপস্থিত ছিলেন।

বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণসাধিকা শ্রদ্ধার অনুদানী শ্রীমতী বনানী চৌধুরী সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী চৌধুরী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একখানি চিত্র শ্রীবাপটজীর করকমলে প্রদান করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সিউড়ী বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

উত্তরবঙ্গে কলেজ ছাত্রদের সঙ্ঘ-শিবির

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের জেলায় জেলায় গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৯ ডিসেম্বর কলেজছাত্র শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিতি নিম্নরূপ : মালদা ২১০, উত্তর মালদা ১৫, উত্তর মুর্শিদাবাদ ৪৯, উত্তর দিনাজপুর ১৩০, দক্ষিণ দিনাজপুর ১০২, ঈশ্বরপুর ১৩, শিলিগুড়ি ২২, জলপাইগুড়ি ১৯, পশ্চিম কোচবিহার ৫০, আলিপুরদুয়ার ৮৩, কোচবিহার ২৩। নতুন গণবেশেই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। প্রান্তস্তরের কার্যকর্তারা বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় মহিলা চেতনা শিবির

গত ১০ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী ব্লকের টকরভাঙা গ্রামে পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী মহিলা চেতনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মুর্শিদাবাদ জেলার মহিলা প্রমুখ চাঁদমণি মুর্মু। জেলার ২২টি গ্রাম থেকে ৮৫ জন মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। চেতনা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় মহিলা প্রমুখ বীণাপাণি দাসশর্মা এবং এবং দক্ষিণবঙ্গের মহিলা প্রমুখ রঞ্জু সিংহ। তাঁরা নারী জাগরণে কল্যাণ আশ্রমের ভূমিকা এবং আদর্শ পরিবার গঠনে মায়েদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের প্রণবানন্দ নগরের পাটুলি শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুকুমার গুপ্ত গত ১৫ ডিসেম্বর মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বেশ কয়েক বছর পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা হিসেবে পুরুলিয়া জেলায় কাজ করেন। সে সময় চিকিৎসক হিসেবে বহু মানুষের সেবা করার সুযোগ তাঁর হয়। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা এবং নাতি-নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। শিশুসুলভ সরলতা, অমায়িক ব্যবহার, প্রখর জাতীয়তাবোধ ও হিন্দু চেতনা ছিল তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য।

* * *

বিশিষ্ট লেখক তথা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অন্যতম সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাসের সহধর্মিণী সীমা বিশ্বাস গত ২৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, ১ কন্যা, জামাতা ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

জলপাইগুড়িতে সক্ষমের আলোচনাসভা

গত ৭ ডিসেম্বর জলপাইগুলি জেলা সক্ষমের উদ্যোগে স্থানীয় 'অগ্রসেন স্মৃতি ভবনে' জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ডাঃ সুকুমারজী। এছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন শিশু নিকেতন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী স্মৃতি দেব। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সক্ষমের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংযোজক চন্দন রায়। আলোচনাসভায় ডাঃ সুকুমারজী কর্নিয়া অন্ধত্বমুক্ত অভিযানের উপর বিশেষ আলোকপাত করেন।

জলপাইগুড়ি সক্ষমের শাখা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা শ্রীমতী সাথি দত্তকে মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি ২০১৬ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার পান। তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন সক্ষমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুকুমারজী।

শোক সংবাদ

গত ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা গোয়াবাগান শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অভিনব ব্রহ্ম পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও পুত্রবধূ, ২ কন্যা, ২ জামাতা ও নাতি নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা মহানগরের স্বয়ংসেবক শল্য চিকিৎসক ডাঃ প্রদীপ নেমানীর মাতৃদেবী নর্বদা নেমানী গত ২২ ডিসেম্বর রাত্রিতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮২ বছর। ২ পুত্র, ৩ কনা, নাতি-নাতনি ও স্বামী বর্তমান।

* * *

আন্দামান-নিকোবরে সঙ্ঘকার্য তথা আনুষঙ্গিক বিবিধ সংগঠনের কাজের স্তম্ভস্বরূপ সকলের প্রিয় সুমিত চৌধুরী গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার টাটা ক্যান্সার হসপিটালে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি মা, স্ত্রী ও ১ কন্যা রেখে গেছেন। সদাহাস্যময় সুমিতা চৌধুরী আন্দামানে একজন সৎ-ন্যায়নিষ্ঠ সমাজসেবী হিসেবে সর্বজনবিদিত ছিলেন। আন্দামান নিকোবর সরকারের এ পি ডব্লিউ ডি বিভাগে উচ্চপদে কর্মরত অবস্থায় যেখানে গেছেন সেখানকার সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সম্প্রতি মধ্যআন্দামানের রঙ্গতে সঙ্ঘ কার্যালয় নির্মাণে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

শব্দরূপ-৮১৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১			২	■	৩
৪	৫		■	■		■	
■		■	■	■	৬	৭	
৮				■	■		■
■		■	■	৯			
১০		১১	■	■	■		■
	■		■	■	১২		
	■	১৩				■	■

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** দ্রোণাচার্যের পুত্র, **৪.** আকাশচারী; পক্ষী, **৬.** নাস্তানাবুদ, **৮.** মগধরাজ; ভীমের হস্তে নিহত, **৯.** অঞ্জলি; জোড়হাত, **১০.** বিনীত প্রার্থনা, **১২.** দিবাবসান; প্রদোষ, **১৩.** শ্রীকৃষ্ণের পত্নী বিশেষ।

উপর-নীচ : **১.** চাকার পাখি, **২.** গজদন্তহীন পুংহস্তি, **৩.** ঢোল বিশেষ, **৫.** চতুর্মুখ, ব্রহ্মা, **৭.** নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ; মৃগশিরা, **১০.** জাপানের রাজা, **১১.** অদ্বৈত মল্লবর্ধনের একটি উপন্যাস, '— একটি নদীর নাম', **১২.** হিমলায়-মেনকার কন্যা; পার্বতী।

সমাধান
শব্দরূপ-৮১৪
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
অজয় দেব
রামপুরহাট, বীরভূম

বি	ন	তা	■	কা	ম	ধে	নু
দু	■	ল	■	নু	■	■	লি
র	■	ন	বী	ন	■	■	য়া
■	■	ব	■	গো	র	■	■
■	■	মী	ন	■	জ	■	■
মে	■	■	রা	য়	ত	■	জ
ন	■	■	ধ	■	গি	■	বা
কা	ল	ঘা	ম	■	রি	সা	লা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৮১৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

বিশ্বের সমস্যাগুলির সমাধান সমাজবাদ নয়, হিন্দুত্ব। এটা এমন এক জীবনদর্শন যা জীবনকে বিচার করার সময় কয়েকটি টুকরাতে ভাগ করে না, বরং সম্পূর্ণ জীবনকে একক মানা হয়। এখানে আমরা হিন্দু জীবন দর্শনগুলিকে বিচার করার সময় কিছু নির্জীব কর্মকাণ্ড বা হিন্দু সমাজে ব্যাপ্ত অহিন্দু কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জুড়তে চাই না। একই সঙ্গে এটা ভাবাও ভুল হবে যে হিন্দুত্ব বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিপন্থী। বিজ্ঞান ও যন্ত্র এই দুইয়ের ব্যবহার এমনভাবে হওয়া উচিত যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পদ্ধতির অনুরূপ হয়।

* * *

আমরা যদি পাশ্চাত্য যন্ত্রব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ করতে থাকি, তাহলে সর্বোদয় বা সমাজবাদ না আমাদের সংস্কৃতির সংরক্ষণ করতে পারবে, না আমাদের সামনে উপস্থিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবে। আমাদেরকে রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও বৈচারিক সর্ব দিক দিয়ে এই যন্ত্রব্যবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। আমাদেরকে ধর্মরাজ্য, গণতন্ত্র, সামাজিক সমানতা ও আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। এই সম্মিলিত ফলাফল থেকে এক এমনই জীবন দর্শন পাওয়া যাবে যা আজকের ঝড় ঝাপটা থেকে আমাদের রক্ষা করবে। আমরা যে নামেই ডাকি না কেন হিন্দুত্ববাদ, মানবতাবাদ বা অন্য কোনো বাদ, কিন্তু এটাই একমাত্র পথ যা ভারত আত্মার অনুরূপ ও জনগণের মধ্যে নবীন উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে। বিভ্রান্তির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বিশ্বকে পথ দেখাতেও সক্ষম হবে।

* * *

একথা মনে রাখতে হবে, যদি ইংরেজি হটাতে হয় তাহলে আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানের ভাবনাকে পুষ্ট করতে হবে। তাই ইংরেজি ভাষার স্তুতি করে কোনো লাভ হবে না। ইংরেজি শাসনে যতই গুণ বা লাভ থাকুক আমরা ইংরেজি শাসন রাখতে পারি না। স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে ব্রিটিশ সমর্থকদের আমরা বলতাম স্বরাজ্যের পিপাসা সুরাজ্য মিটাতে পারে না। আজও স্বভাষার আবশ্যকতা সুভাষা দ্বারা পূরণ হতে পারে না।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা
'থাকে যদি ডাটা,
জমে যায় রান্নাটা'
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
DUTA
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
Curry Powder
RED CHILLI POWDER
CORIANDER POWDER
Pure Indian Spices
fssai
Lic. No.
12812019005087
রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

বৈদিক গণিত ভারতের প্রাচীন গরিমার অঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বৈদিক যুগ ভারতকে অনেক কিছু দিয়েছে। বৈদিক গণিত তাদের অন্যতম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকের ভারতের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষই বৈদিক গণিতের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিকড় অনুসন্ধানে সম্প্রতি আই সি সি আর-এর পূর্বাঞ্চলীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক বৈদিক গণিত সম্মেলন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী এম. জে. আকবর বলেন, 'আর্যভট্ট, ব্রহ্মদত্ত, কঙ্ক, ভাস্করের মতো গণিতজ্ঞের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। সারা বিশ্বের কাছে গণিত ও জোতির্বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের গরিমা রয়েছে। অথচ গত তিন দশক ধরে আমরা সেই গরিমা ভরা অতীত হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অতীত ঐতিহ্য জানতে বৈদিক গণিতের চর্চা জরুরি।' আন্তর্জাতিক গণিতজ্ঞ জেমস গ্রোভার বলেন, 'গণিত হলো সঙ্গীতের মতো। যার মূলে রয়েছে কিছু সূত্র। বৈদিক গণিত চর্চায় যার সন্ধান করব।' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী, আইসিসিআর পূর্বাঞ্চলের অধিকর্তা ড. গৌতম রায়, ডিরেক্টর জেনারেল অমরেন্দ্র খাটুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লেজার প্রাচীর, স্মার্ট সেন্সর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের নদনদী-সংলগ্ন এবং প্রহরীবিহীন অঞ্চলগুলিতে লেসার প্রাচীর ও স্মার্ট সেন্সর বাসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লেসার প্রাচীর এবং স্মার্ট সেন্সর বসাব। সীমান্তের যে-সব জায়গায় ফেন্সিং নেই এবং নদনদীর আধিক্যের কারণে যেসব জায়গায় প্রহরা একটু শিথিল, আমরা শুরু করতে চাই সেখান থেকে।' বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত দল সংশ্লিষ্ট অঞ্চল খতিয়ে দেখে ইতিমধ্যেই পাইলট প্রজেক্ট তৈরি করেছে। প্রয়োজনীয় জমিও চাওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের কাছে। ওই আধিকারিক জানান, 'উপগ্রহ-প্রযুক্তি নির্ভর সিগন্যাল কম্যান্ড সিস্টেমের মাধ্যমে কাজ করবে স্মার্ট সেন্সর। বিপ বিপ শব্দে বিপদ সংকেত পাওয়া মাত্র সজাগ হয়ে যাবেন রক্ষীরা।' সীমান্তরক্ষী বাহিনীর অন্য একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, বাহিনীর এই প্রয়াস কেন্দ্রীয় সরকারের সীমান্ত রক্ষানীতির অন্তর্গত। কেন্দ্রীয় সরকার অনেকদিন ধরেই ইসলামি জঙ্গি এবং অন্যান্য ভারত-বিরোধী শক্তির অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কাশ্মীর সীমান্তের অনুকরণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে লেসার প্রাচীর ও স্মার্ট সেন্সর বসানোর কথা ভাবছে। সেই ভাবনার রূপ দিতে প্রাথমিক পদক্ষেপ নিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯
সবার প্রিয়
বিল্লদা ®
চানাচুর

অগ্নি ৪-এর সফল উৎক্ষেপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি ওড়িশার বালেশ্বরে ভারতের ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি ৪-এর উৎক্ষেপণ সফল হয়েছে। অগ্নি ৪ ভূমি থেকে ভূমিতে আঘাত হানতে সক্ষম। এর দৈর্ঘ্য ২০ মিটার এবং ওজন ১৭ টন। সর্বাধিক এক টন ক্ষমতা সম্পন্ন পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রটি ৪০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা এবং উন্নয়ন পর্ষদের (ডি আর ডি ও) ডিজাইন এবং গবেষণায় তৈরি হয়েছে অগ্নি ৪। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অগ্নি ৫-এর সফল উৎক্ষেপণ করেছে ভারত। অগ্নি- ৫ পাঁচ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত আঘাত হানতে সক্ষম। অগ্নি ৪ নির্মাণে যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র-প্রযুক্তির সঙ্গে তুলনীয়। অগ্নি ৪ এবং ৫ নির্মাণে সাম্প্রতিক সাফল্য চীন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতকে কৌশলগত দিক থেকে এগিয়ে দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পরিষেবায় খুশি হলে পরিষেবা কর, নয়তো নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬-তে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে পরিষেবায় সন্তুষ্ট হলেই ক্রেতা পরিষেবা কর দেবেন, নয়তো নয়। অথচ এতকাল কোনো সরকার ক্রেতা সুরক্ষার এই দিকটিতে গুরুত্ব দেয়নি। ফলস্বরূপ সারা দেশের হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলির একাংশ পরিষেবার গুণগত মানের তোয়াক্কা না করেই সাধারণ ক্রেতাদের পরিষেবাকর দিতে বাধ্য করত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই অন্যায় প্রবণতা বন্ধ করার জন্য ক্রেতা সুরক্ষা আইন ১৯৮৬ সঠিকভাবে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ক্রেতা-সুরক্ষা আইন অনুযায়ী ভোগ্যপণ্যের বিক্রি বা বিজ্ঞাপন অথবা কোনো পরিষেবা প্রদানের যদি কেউ অবৈধ পন্থা অবলম্বন করেন তা হলে তা আইনের চোখে অপরাধ। ক্রেতা চাইলে সংশ্লিষ্ট বিক্রেতা বা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
9 January - 2017 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।